দ্বিতীয় অধ্যায়

সত্যানুসন্ধিৎসার সাধনা

উনিশ শতকে, চিন্তার জগতে, বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাবের আগে থেকেই, বাঙালি মনীষার চিন্তার জগৎ ছিল বিস্তীর্ণ। কিন্তু এই বিস্তীর্ণ চিন্তার জগতের মধ্যে একটি ঐক্য ছিল — তা' হল ইহ চেতনার প্রাধান্য। এই ইহ চেতনার পথ ধরেই এসেছিল ইতিহাস চেতনা। যদিও সে চেতনা বঙ্কিমচন্দ্রের বঙ্গচেতনা নয়; তবু সাধারণ ইতিহাস চেতনার পথ ধরেই বঙ্কিমচন্দ্রের বঙ্গচেতনার জন্ম। তাই বঙ্কিমচন্দ্রের বঙ্গচেতনাকে বুঝতে হলে আমাদের সে সাধারণ ইতিহাস-চেতনার প্রাথমিক স্পন্দনকে অনুধাবন করতে হবে।

১৮১৭ খ্রিস্টাব্দে, বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মের আগেই, হিন্দু—কলেজের প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে নব—শিক্ষার সূত্রপাত হয়। তার ফলে হিন্দু কলেজের ছাত্ররা ইংরেজি শিক্ষা পেয়ে কাব্য ও দর্শনের সঙ্গে ইতিহাসের প্রতিও আকর্ষণ অনুভব করেন। বিশেষ করে ইতিহাস তাঁদের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করে। " তখনও তাঁদের কোন স্থায়ী জীবনাদর্শ গড়ে ওঠেনি বলে প্রকৃতির নিয়মের মতো ইতিহাসের নীতিই ছিল তাঁদের একমাত্র নীতি।" [১]

১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দে বড়লাট বেন্টিঙ্ক কর্তৃক 'মেকলে মিনিট'[২] গৃহীত হলে বাংলাদেশে নবশিক্ষার দ্বিতীয় পর্বের সূচনা হয়। এই সময় বাংলার ইতিহাস বিদ্যালয়ের নিম্নশ্রেণীতে পাঠ্য হয় এবং শিক্ষার্থীদের জন্য বাংলার ইতিহাস রচিত হতে থাকে।[৩] এই উদ্দেশ্যে রচিত হয়ে জন ক্লার্ক মার্শম্যানের History of Bengal গ্রন্থটি ১৮৩১ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। ছাত্রপাঠ্য গ্রন্থ হিসাবে গ্রন্থটির একাধিক বঙ্গানুবাদও হয়।

১৮৩৮ খ্রিস্টাব্দে, যে বছর বঙ্কিমচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন, সে বছরই 'সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা' (Society for the Acquisation of General knowledge) স্থাপিত হয়। কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, গোবিন্দ চন্দ্র সেন, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, প্যারীচাঁদ মিত্র, রাধানাথ শিকদার প্রভৃতি 'ইয়ং — বেঙ্গল —এর

দল এই সভার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তাঁরা এই সভায় যে সব বিষয়ের আলোচনা করতেন, যে সব প্রবন্ধ পাঠ করতেন, তাতে ইতিহাসের একটা গুরুত্বপূর্ণ স্থান ছিল। তাঁদের অনেক প্রবন্ধ 'দি ফ্রেন্ড অব ইন্ডিয়া', 'এনকোয়ারার', 'বেঙ্গল স্পেকটেটর' প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত হত। ইতিহাস বিষয়ক কয়েকটি প্রবন্ধ হল — কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'On the Nature and Importance of the Study of History', প্যারিচাঁদ মিত্রের 'The States of Hindoostan Under the Hindoos', 'The zeminder and the Ryot', গোবিন্দ চন্দ্র সেনের 'Brief outline of the History of Hindoostan'. এইসব প্রবন্ধ নব্যশিক্ষিত বাঙালিদের মধ্যে ইতিহাস-চেতনা সঞ্চারে সহায়তা করেছিল।

১৮৪২ খ্রিস্টাব্দে দ্বারকানাথ ঠাকুর ইংলন্ড থেকে স্বদেশে ফেরার সময় ইংলন্ডের ক্রীতদাস প্রথা বিরোধী আন্দোলনের নেতা জর্জ টমসনকে সঙ্গে করে নিয়ে আসেন। টমসন বাংলাদেশের তরুণদের স্বদেশের প্রাচীন ইতিবৃত্ত এবং বর্তমান অবস্থা ভালভাবে জানতে উৎসাহিত করেন। টমসনের অভিপ্রায়কে চরিতার্থ করে ১৮৪৬ খ্রিস্টাব্দে 'ক্যালকাটা রিভিউ' পত্রিকায় প্যারিচাঁদ মিত্রের **'The Zeminder and the Ryot'**. প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধটিতে দেশের প্রাচীন ও বর্তমান অবস্থার পর্যালোচনা ছিল। 'বঙ্গদেশের কৃষক' রচনার সময় বঙ্কিমচন্দ্র এই আদর্শকে অনুসরণ করেছেন।

ছাত্রাবস্থা থেকেই বঙ্কিমচন্দ্র ইতিহাসের অনুরাগী পাঠক ছিলেন এবং সে বিষয়ে যথেষ্ট কৃতিত্ব অর্জন করেছিলেন। ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে অনুষ্ঠিত সিনিয়র বৃত্তি পরীক্ষায় বঙ্কিমচন্দ্র হুগলী কলেজ থেকে **'Highest proficiency in all subjects'** প্রদর্শন করেন। পরীক্ষায় বিভিন্ন বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের নম্বর ছিল নিম্নরূপ:-

Literature - 55, History - 82, Mathematics - 67.5,
Natural Philosophy - 74.3, Translation - 76,
Total - 354.8.[8]

স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে যে, ইতিহাসে বঙ্কিমচন্দ্রের কৃতিত্ব ছিল সর্বাধিক।

" 'সিনিয়র স্কলারশিপ' পরীক্ষা দেওয়ার সময় বঙ্কিমচন্দ্র ডেভিড হিউমের 'হিস্ট্রি অব ইংল্যান্ড', উইলিয়াম রবার্টসনের 'হিস্ট্রি অব দি রেইন অফ্ চার্লস দি ফিফ্থ', জেমস মিলের 'হিস্ট্রি অফ ইন্ডিয়া', আর. মন্স্টুয়ার্ট এলফিনস্টোনের 'রাইজ অব দি ব্রিটিশ পাওয়ার ইন দি ইস্ট' পড়েছিলেন।" [৫] তাছাড়া বি.এ. পরীক্ষা দেওয়ার সময় তাঁকে — "History which included History of England and of British India and Ancient History with special reference to the History of Greece to the death of Alexander; History of the Rome to the death of Augustan and the History of the Jews". [৬] পড়তে হয়েছিল।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলেছেন — "At College Bankim Chandra was a voracious reader of history and he always longed to be a distinquished historian." [৭] কিন্তু তাঁর পঠিত ইতিহাস ছিল প্রধানত ইউরোপ ও ভারতবর্ষের ইতিহাস। সে কালের শিক্ষানীতি অনুসারে বঙ্কিমচন্দ্র জুনিয়র সেক্সনের পরে আর স্কুল-কলেজে বাংলার ইতিহাস পড়েন নি। সে সময়ে কোন শ্রদ্ধাযোগ্য বাঙ্লার ইতিহাস রচিত হয়নি। [৮] বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং স্টুয়ার্ট, মার্শম্যান প্রভৃতির রচিত বাঙ্লার ইতিহাসের নিন্দা করেছেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের বঙ্গপ্রীতি প্রশ্নাতীত। কিন্তু তাঁর অন্তরে এই বঙ্গপ্রীতির বীজ কি ভাবে অঙ্কুরিত হয়েছিল তা' আমাদের জানা নেই। প্রবোধ চন্দ্র সেন অনুমান করেছেন — "সম্ভবত: হুগলী কলেজে পড়বার সময় থেকেই ইংলন্ডের ইতিহাসের তুলনায় বাঙ্লার ইতিহাসের ক্ষীণতা ও দীনতা বঙ্কিমচন্দ্রের চিত্তকে পীড়িত করতে শুরু করে। এই বেদনাই কালক্রমে বৃদ্ধি পেয়ে তাঁকে বাঙ্লার ইতিহাস উদ্ধারে প্রবর্তিত করে।" [৯] পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় জানিয়েছেন — " বঙ্কিমচন্দ্র বাল্যে ও কৈশোরে গল্প শুনিতে ভালবাসিতেন। কিন্তু যে সে লোকের নিকট নহে, কিংবা যা তা গল্প নহে — সেকালের লোকের নিকট সেকালের গল্প। .... আমাদের খুল্লপিতামহ একশত আট বৎসর বয়:ক্রম পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। .... তাঁহার নিকট বঙ্কিমচন্দ্র ও আমরা সকলে গল্প শুনিতাম। যাহা শুনিতাম তাহা বাঙ্গালার ইতিহাসের অন্তর্গত ; .... ।" [১০] অনুমান করি এথেকেও বঙ্কিমচন্দ্রের

অন্তরে বঙ্গপ্রীতির বীজ অঙ্কুরিত হয়ে থাকতে পারে।

১৮৭২ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে, ১২৭৯ বঙ্গাব্দের ১লা বৈশাখ বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকা প্রকাশ করেন। পত্রিকার 'বঙ্গদর্শন' নামকরণের মধ্যেই তাঁর বঙ্গ-প্রীতির পরিচয় লুকিয়ে আছে। 'বঙ্গদর্শন' - এর মধ্যে তিনি বঙ্গের সমগ্র রূপকে ধরতে চেয়েছেন। অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য্য লিখেছেন — " শুধু বিদ্যা ও জ্ঞানের চর্চার জন্য নয়, বাংলা দেশকে জানব বুঝব আবিষ্কার করব, মাতৃভাষার উন্নতি সাধন করব — তাই পত্রিকার নাম বঙ্গদর্শন।" [১১]

'বঙ্গদর্শন' পত্রিকা শুধুমাত্র সাহিত্য সাধনার উদ্দেশ্য নিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র প্রকাশ করেন নি। কি কারণে 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকা প্রকাশিত হল তা' 'পত্রসূচনা'য় বঙ্কিমচন্দ্র ব্যক্ত করে বলেছিলেন — " আরও অনেক কাজ করিব, বাসনা করি।" [১২] কিন্তু, আরও অনেক কাজ বলতে তিনি কী বুঝিয়েছেন তার ব্যাখ্যা 'পত্রসূচনা'য় নেই। ডঃ সত্যনারায়ণ দাশ 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার বিভিন্ন বর্ষের সূচীপত্রের বিশ্লেষণ করে বিষয়টি অনুমান করেছেন। সে অনুমানের মধ্যে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল — " .... সম্ভব হলে বাংলাদেশের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনা — অন্যথায় সে ইতিহাস রচনায় বঙ্গবাসীকে অনুপ্রাণিত করা, জাতির মধ্যে ইতিহাস চেতনার সঞ্চার করা ; .... জাতিচিত্তে জাতীয়তা সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা উৎপাদন ও ঐক্যবোধ জাগ্রত করা — তদানীন্তন আবেগ-সঞ্চালিত জাতীয়তা-বোধের পরিবর্তে জাতিকে আবেগ বর্জিত উন্নয়নমূলক স্বদেশচিন্তায় উদ্বুদ্ধ করা ; .... দেশের অতীত সংস্কৃতি দর্শন জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্পর্কে শ্রেষ্ঠতাবোধ জাগানো এবং এভাবে দেশবাসীর হীনমন্যতা দূর করা ; ....।" [১৩]

বঙ্গদর্শনের অনেক ভাবনা ও বাসনার মধ্যে অন্যতম একটি ছিল স্বদেশের প্রকৃত ইতিহাস উদ্ধার। এই পত্রিকার মাধ্যমে বঙ্কিমচন্দ্র বাঙালির অন্তরে ইতিহাস-তৃষ্ণা জাগাতে চেয়েছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন যে, বাংলার ইতিহাস বাঙালির দ্বারা বাংলা ভাষায় রচিত হোক। বিমলা প্রসাদ মুখার্জী বলেছেন — "Bankim Chandra Chatterji, ... was however responsible for a drive in reconstructing the history of Bengal. His famous journal Bangadarshan become a

forum where the elite of Bengal met and discussed the problems of cultural history .... he was a social thinker who stressed the need for history, for knowing it and writing it in our mothertongue."[১৪]

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী লিখেছেন — " তাঁহার (বঙ্কিমচন্দ্রের) নিতান্ত ইচ্ছা ছিল, তিনি বাঙ্গালার একখানি ইতিহাস লিখিয়া যান।" [১৫] বঙ্কিমচন্দ্রও বলেছেন যে — " এক সময়ে ইচ্ছা করিয়াছিলাম, বাঙ্গালার ঐতিহাসিক তত্ত্বের অনুসন্ধান করিয়া, একখানি বাঙ্গালার ইতিহাস লিখিব।" [১৬] কিন্তু নানা কারণে বঙ্কিমচন্দ্রের সে ইচ্ছা পূর্ণ হয়নি। তবে অন্যকে এ কাজে প্রবৃত্ত করার জন্য তিনি বাংলার ইতিহাস বিষয়ে অনেকগুলি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। প্রবন্ধগুলি হল :—

১।	বঙ্গে ব্রাহ্মণাধিকার — প্রথম প্রস্তাব	(বঙ্গদর্শন, ভাদ্র, ১২৮০)
২।	বঙ্গে ব্রাহ্মণাধিকার — দ্বিতীয় প্রস্তাব	(বঙ্গদর্শন, অগ্রহায়ণ ১২৮২)
৩।	বাঙ্গালার ইতিহাস	(বঙ্গদর্শন, মাঘ, ১২৮১)
৪।	বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা	(বঙ্গদর্শন, অগ্রহায়ণ, ১২৮৭)
৫।	বাঙ্গালীর উৎপত্তি	(বঙ্গদর্শন, পৌষ, ১২৮৭ থেকে জ্যৈষ্ঠ, ১২৮৮ পর্যন্ত ছ'টি সংখ্যায় প্রকাশিত।)
৬।	বাঙ্গালার ইতিহাসের ভগ্নাংশ	(বঙ্গদর্শন, জ্যৈষ্ঠ, ১২৮৯)
৭।	মুসলমান কর্তৃক বাঙ্গালা বিজয়	(বঙ্গদর্শন, আশ্বিন, ১২৮৯)[১৭]
৮।	বাঙ্গালার কলঙ্ক	(প্রচার, শ্রাবণ, ১২৯১)

এছাড়া 'বঙ্গদেশের কৃষক' (বঙ্গদর্শন, ভাদ্র, কার্ত্তিক, পৌষ, ফাল্গুণ, ১২৭৯) প্রবন্ধটি ঐতিহাসিক প্রবন্ধ না হলেও এতে গভীর ইতিহাস নিষ্ঠার পরিচয় আছে এবং 'বাঙ্গালীর বাহুবল' (বঙ্গদর্শন, শ্রাবণ, ১২৮১) প্রবন্ধটি বঙ্গপ্রীতির প্রত্যক্ষ প্রেরণা থেকে রচিত হয়েছে।

প্রবন্ধগুলির বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, বঙ্কিমচন্দ্র বাংলাদেশের ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে নৃ-তত্ত্ব, রাজবৃত্ত এবং লোকবৃত্ত — এই তিনটি দিকেই গুরুত্ব দিয়েছেন। প্রবন্ধগুলি একদা সত্যানুসন্ধিৎসার প্রবৃত্তি ও দেশপ্রীতির আবেগ সহকারে ইতিহাসবিহীন বাঙালি জাতির কাছে ইতিহাস-চর্চার ক্ষেত্রে দিগ্‌দর্শনের কাজ করেছে।

ইতিহাস চর্চার প্রাথমিক কথা জাতিতত্ত্ব আলোচনা। বাংলাদেশে জাতিতত্ত্ব আলোচনার সূত্রপাত করেন এইচ.টি.কোলব্রুক। ১৭৯৮ খ্রিস্টাব্দে Asiatic Researches (Vol.I, p.52-67) পত্রিকায় তাঁর 'Enumeration of Indian Classes' নামক প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়। তবে " বঙ্কিমচন্দ্রই বাঙ্গালায় বাঙ্গালা ভাষায় জাতিতত্ত্ব আলোচনারও গুরু, কেননা তাঁহার প্রথম প্রস্তাব (বঙ্গে ব্রাহ্মণাধিকার) লালমোহন বিদ্যানিধির 'সম্বন্ধ নির্ণয়' গ্রন্থের পূর্বে প্রকাশিত হইয়াছিল।" [১৮]

বঙ্গে ব্রাহ্মণাধিকার – প্রথম প্রস্তাব

বঙ্গে ব্রাহ্মণাধিকার – প্রথম প্রস্তাবে বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদেশে আর্যজাতির আগমন কাল নির্ণয়ে প্রয়াসী হয়েছেন। প্রস্তাবের সূচনাতেই বঙ্কিমচন্দ্র ইউরোপীয় পন্ডিতদের এ মত স্বীকার করে নিয়েছেন যে, আর্যরা ইরাণ বা তৎসন্নিহিত কোন অঞ্চল থেকে ভারতে আসেন। প্রথমে তাঁরা পাঞ্জাবে আসেন এবং পরে পূর্বদেশ অধিকার করেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের মতে — " এক্ষণে যাহাকে বঙ্গদেশ বলা যায়, তাহার দক্ষিণ পশ্চিমাংশ পৌন্ড্র নামে খ্যাত ছিল। যে অংশ মধ্যে কলিকাতা, বর্ধমান, মুরশিদাবাদ, তাহা সেই অংশের অন্তর্গত। যাঁহারা সবিশেষ অবগত হইতে চাহেন, তাঁহারা উইলসন্ কৃত বিষ্ণুপুরাণানুবাদের প্রদেশতত্ত্ব বিষয়ক পরিচ্ছেদটি দেখিবেন। বঙ্গ, পুন্ড্র হইতে একটি পৃথক রাজ্য ছিল। এক্ষণে বাঙ্গালীতে ঢাকা বিক্রমপুর অঞ্চলকেই 'বঙ্গদেশ' বলে—

সেই প্রদেশকেই প্রাচীনকালে বঙ্গদেশ বলিত। কিন্তু অগ্রে পুণ্ড্র, পরে বঙ্গ। মহাভারতের সভাপর্বে আছে, ভীম দিগ্বিজয়ে আসিয়া পুণ্ড্রাধিপতি বাসুদেব এবং কৌশিকীকচ্ছবাসী মনৌজ রাজা, এই দুই মহাবল মহাবীরকে পরাজয় করিয়া বঙ্গরাজের প্রতি ধাবমান হইলেন।" [১৯] অর্থাৎ বঙ্কিমচন্দ্র বলতে চেয়েছেন যে, আর্যরা প্রাচীন 'বঙ্গদেশে' আসার আগে পুণ্ড্রদেশে এসেছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের মতে আধুনিক 'বঙ্গদেশের' প্রধানাংশ আগে 'পৌণ্ড্রদেশ' বলে পরিচিত ছিল এবং আধুনিক মালদহের অন্তর্গত পান্ডুয়া নামক অঞ্চল হল পুণ্ড্রদেশের প্রাচীন রাজধানী পৌণ্ড্রবর্ধন। বঙ্কিমচন্দ্রের সময়ে সমুদ্রতীর থেকে পদ্মাতীর পর্যন্ত অঞ্চলে অনেক পুঁড়া ও পোদ জাতীয়ের বাস ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র তাদের 'পৌণ্ড্রদিগের বংশ' বিবেচনা করেছেন এবং অনুমান করেছেন যে, পুঁড়া ও পোদ শব্দ দু'টি পুণ্ড্রশব্দের অপভ্রংশ। মহাভারতকার পুণ্ড্রদের অনার্যজাতি হিসাবে বর্ণনা করেছেন বলেও বঙ্কিমচন্দ্র আমাদের জানিয়েছেন।

বঙ্কিমচন্দ্র শতপথ ব্রাহ্মণ, মনুসংহিতা, মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থ পর্যালোচনা করে দেখিয়েছেন যে, কোনো প্রাচীন গ্রন্থেই বাংলাদেশে আর্যজাতির বসবাসের উল্লেখ নেই। অতএব তিনি সিদ্ধান্ত করেছেন যে — "যখন শতপথ ব্রাহ্মণ প্রণীত হয়, তখন এদেশে আর্য্য জাতির অধিকার হয় নাই, যখন মনুসংহিতা সঙ্কলিত হয়, তখনও হয় নাই, এবং যখন মহাভারত প্রণীত হয়, তখনও হয় নাই। ইহার কোন্‌খানি কোন্ কালে সঙ্কলিত বা প্রণীত হয়, তাহা পণ্ডিতেরা এ পর্য্যন্ত নিশ্চিত করিতে পারেন নাই। কিন্তু ইহা সিদ্ধ যে, যখন ভারতে বেদ, স্মৃতি এবং ইতিহাস সঙ্কলিত হইতেছিল, তখন এদেশ (বঙ্গদেশ) ব্রাহ্মণশূন্য অনার্য্যভূমি।" [২০]

বঙ্গে ব্রাহ্মণাধিকার — দ্বিতীয় প্রস্তাব

বঙ্গে ব্রাহ্মণাধিকার — প্রথম প্রস্তাবের উপসংহারে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছিলেন — "এ বিষয়ে আমাদিগের অনেক কথা বাকি রহিল, অবকাশ হয় ত পশ্চাৎ বলিব।" [২১] বঙ্কিমচন্দ্রের এই 'অবকাশ' হয় দীর্ঘ দু'বছর পরে। লালমোহন বিদ্যানিধি ভট্টাচার্য্য প্রণীত 'বঙ্গদেশীয় আদিম জাতি সমূহের সামাজিক বৃত্তান্ত' "সম্বন্ধ-নির্ণয়" (১৮৭৫) গ্রন্থের আলোচনা উপলক্ষ্যে রচিত 'বঙ্গে ব্রাহ্মণাধিকার — দ্বিতীয় প্রস্তাব'-এ।

আলোচনার সূচনাতেই 'সম্বন্ধ - নির্ণয়' গ্রন্থটির প্রশংসা করে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন — " পন্ডিত শ্রীযুক্ত লালমোহন বিদ্যানিধি প্রণীত এই গ্রন্থখানি, ইউরোপে প্রচারিত হইলে, একটা কোলাহল বাঁধিয়া উঠিত ; বঙ্গদেশের প্রাচীন ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে অতি উৎকৃষ্ট পুস্তক বলিয়া বড় প্রশংসা পড়িয়া যাইত ; এবং অন্ততঃ কিছুকাল সকলের মুখে ইহার প্রশংসা শুনা যাইত।" [২২] 'সম্বন্ধ-নির্ণয়' গ্রন্থটি শুধুমাত্র ব্রাহ্মণদের ইতিবৃত্ত-বিষয়ক নয়। কায়স্থ ও বৈদ্যদের ইতিবৃত্তও এতে সংগৃহীত হয়েছে। তবে ব্রাহ্মণদের বিবরণ এখানে বিশেষভাবে পর্যালোচিত হয়েছে এবং অন্য জাতির ইতিহাস সে আলোচনার আনুসঙ্গিক হিসাবে এসেছে মাত্র।

বঙ্কিমচন্দ্র লক্ষ্য করেছেন যে, বিদ্যানিধি মহাশয় তাঁর 'সম্বন্ধ-নির্ণয়' গ্রন্থে অত্যন্ত পরিশ্রম করে প্রভূত প্রমাণ বা বিষয় সন্নিবিষ্ট করেছেন, যা সাধারণত কোনো বাঙালি লেখক করেন না। বঙ্কিমচন্দ্র এই সব প্রমাণ বা বিষয়ের উপর নির্ভর করেই বাংলাদেশের ব্রাহ্মণদের সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। কিন্তু ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে যেহেতু গ্রন্থটি ত্রুটিশূন্য নয়, তাই বঙ্কিমচন্দ্র প্রকৃত সত্য নির্ধারণের জন্য স্বকীয় বিচার এবং রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সিদ্ধান্তের সহায়তা নিয়েছেন।

ভারতীয় আর্যজাতি চতুর্বর্ণ। বঙ্কিমচন্দ্রের বিবেচনা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য প্রকৃত আর্যজাতি। শূদ্র অনার্য জাতি। বাংলাদেশে ক্ষত্রিয় আসেনি, বৈশ্য কদাচিৎ বাণিজ্যার্থে এসেছে। বাংলাদেশে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য নেই, আছে শুধু ব্রাহ্মণ ও শূদ্র। তবে ব্রাহ্মণেরা চিরকাল বাংলাদেশে বসবাসকারী ছিলেন না। আদিশূর ৯৪২ খ্রিস্টাব্দে কান্যকুব্জ থেকে

পাঁচজন ব্রাহ্মণকে আনার আগে বাংলাদেশে সাড়ে সাত শত ঘর ব্রাহ্মণ ছিলেন। পাঁচজন ব্রাহ্মণ আসার দেড়শ' বছর পরে বল্লাল সেন তাঁদের বংশধরদের মধ্যে কৌলিন্য প্রথা চালু করেন। ঐ দেড়শ' বছরে পাঁচজন ব্রাহ্মণ এগারশ' ঘরে পরিণত হয়েছিল।

বঙ্কিমচন্দ্রের বিবেচনায় – "খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর অষ্টম শতাব্দীর পূর্বে বাঙ্গালা ব্রাহ্মণশূন্য অনার্যভূমি ছিল।" [২৩] কারণ হিসাবে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন যে, প্রাচীন আর্যজাতি যেখানে বাস করেছেন সেখানেই ব্রাহ্মণেরা তাঁদের পাণ্ডিত্যের চিহ্ন স্বরূপ নানা গ্রন্থ রচনা করেছেন। কিন্তু অষ্টম শতাব্দীর আগে কোন বঙ্গবাসী গ্রন্থকারের পরিচয় পাওয়া যায় না। কল্লভট্ট, জয়দেব, গোবর্দ্ধনাচার্য্য, হলায়ুধ, উদয়নাচার্য প্রভৃতি সকলেই আদিশূরের পরবর্তীকালের এবং ভট্টনারায়ণ ও শ্রীহর্ষ তাঁর সমসাময়িক কালের গ্রন্থকার। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, অষ্টম শতাব্দীর আগে বাংলাদেশে ব্রাহ্মণ ছিল না, বা থাকলেও তাদের সংখ্যা নিতান্ত অল্প ছিল।

এই প্রস্তাবে বঙ্কিমচন্দ্র ব্রাহ্মণদের সম্পর্কে যা বলেছেন কায়স্থদের সম্পর্কেও সেই একই কথা বলতে চেয়েছেন। বিদ্যানিধি মহাশয় কায়স্থদের সৎশূদ্র বললেও বঙ্কিম-চন্দ্রের মতে তারা বর্ণশঙ্কর এবং সে কারণেই আর্যবংশসম্ভূত। আদিশূরের সময় পাঁচজন ব্রাহ্মণের সঙ্গে পাঁচজন কায়স্থও কান্যকুব্জ থেকে বাংলাদেশে এসেছিলেন। তার আগে বাংলায় যেমন ব্রাহ্মণেরা ছিলেন তেমনি কায়স্থরাও ছিলেন, কিন্তু অল্প সংখ্যক।

উনিশ শতকে শিক্ষিত বাঙালির মনে যে আর্যগৌরব বোধ জাগ্রত হয়েছিল স্বাভা-বিক কারণেই বঙ্কিমচন্দ্র তার ব্যতিক্রম ছিলেন না। কিন্তু 'বঙ্গে ব্রাহ্মণাধিকার – দ্বিতীয় প্রস্তাব'–এ বঙ্কিমচন্দ্র যা সপ্রমাণ করতে চাইলেন তাতে আধুনিক ইংরেজদের সামনে প্রাচীন সভ্য জাতি হিসাবে বাঙালির স্পর্ধা করার ক্ষমতা কিঞ্চিত লঘু হয়ে পড়ল। বিষয়টি সম্পর্কে সচেতন হয়ে বঙ্কিমচন্দ্রকে তাই মন্তব্য করতে হল — " আমরা দেখিতেছি না যে অগৌরব কিছু হইল। আমরা সেই প্রাচীন আর্যজাতি সম্ভূতই রহিলাম – বাঙ্গালায় যখন আসি না কেন, আমাদিগের পূর্বপুরুষগণ সেই গৌরবান্বিত আর্য। বরং গৌরবের বৃদ্ধিই হইল। আর্যগণ বাঙ্গালায় তাদৃশ কিছু মহৎ কীর্তি রাখিয়া যান নাই — আর্যকীর্তিভূমি উত্তর–পশ্চিমাঞ্চল। এখন দেখা যাইতেছে যে আমরা যে কীর্তি ও যশেরও উত্তরাধিকারী।

সেই কীর্তিমন্ত পুরুষগণই আমাদিগের পূর্বপুরুষ।" [২৪]

বঙ্কিমচন্দ্রের মতে তুর্কী আক্রমণের সময় আর্যরা এদেশে ঔপনিবেশিক শক্তি মাত্র এবং তখনও বঙ্গীয় আর্যদের অভ্যুদয়ের সময় আসেনি, সে কারণে, সপ্তদশ অশ্বারোহীর বঙ্গজয় কনৌজ আর্যদের ক্ষেত্রে নঘু করে দেখা যেতে পারে। তাঁর মতে এখন (উনিশ শতক) সে অভ্যুদয়ের সময় উপস্থিত। তিনি আশা প্রকাশ করেছেন যে, বাঙালি জাতি অচিরে পৃথিবীর মধ্যে যশস্বী হবে। বঙ্কিমচন্দ্রের এই আকাঙ্ক্ষার কথা হরপ্রসাদ শাস্ত্রীও আমাদের জানিয়েছেন। — " 'রিনাইসেন্স' (Renaissance) ইতিহাস তিনি খুব আয়ত্ত করিয়াছিলেন এবং সেই পথ ধরিয়া বাঙ্গালারও আবার যাহাতে নবজীবন সঞ্চার হয়, তাহার জন্য তিনি বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিতেন।" [২৫] বঙ্কিমচন্দ্রের এ আশা ব্যর্থ হয়নি। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদ মধ্যেই বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, অরবিন্দ, সুভাষচন্দ্র প্রভৃতি বিশ্ববিশ্রুত বাঙালির আবির্ভাব হয়েছে।

তবে 'খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর পূর্বে বাঙ্গালা ব্রাহ্মণশূন্য অনার্য্যভূমি ছিল' বঙ্কিমচন্দ্রের এ মত সঠিক নয়। কারণ, খ্রিস্টীয় প্রথম শতাব্দী থেকেই আর্যরা নানা কারণে বাংলাদেশে আসতে এবং বসবাস করতে শুরু করেন। খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতাব্দী থেকেই বাংলাদেশে অগণিত ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণ্য প্রতিষ্ঠানের সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে ; বিভিন্ন তাম্রশাসনেও তার উল্লেখ আছে। [২৬]

এছাড়া গৌড়ের রাজা আদিশূর বৈদিক যজ্ঞানুষ্ঠান করার জন্য কান্যকুব্জ থেকে পাঁচজন সাগ্নিক ব্রাহ্মণ আনেন এবং পরবর্তীকালে আগত বৈদিক প্রভৃতি কয়েকটি বিশিষ্ট শ্রেণীর অল্পসংখ্যক ব্রাহ্মণ ব্যতীত বাংলাদেশের প্রায় সব ব্রাহ্মণই কান্যকুব্জ থেকে আসা পঞ্চ-ব্রাহ্মণের সন্তান — এমত গ্রহণযোগ্য নয়। অক্ষয় কুমার মৈত্রেয়, রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং রমেশচন্দ্র মজুমদারও এমত গ্রহণযোগ্য মনে করেননি। তবে 'সম্বন্ধ নির্ণয়' প্রণেতা যখন এমত প্রকাশ করেন তখন এমত " রাজেন্দ্রলাল মিত্রও বিশ্বাস করিতেন, বঙ্কিমচন্দ্রও বিশ্বাস করিতেন।" [২৭]

বাঙ্গালার ইতিহাস

'বাঙ্গালার ইতিহাস' প্রবন্ধটি রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রণীত 'প্রথম শিক্ষা বাঙ্গালার ইতিহাস' পুস্তকের আলোচনা উপলক্ষে রচিত। আলোচনার সূচনাতেই বঙ্কিমচন্দ্র বেদনাহত কণ্ঠে বলেছেন — "সাহেবেরা যদি পাখী মারিতে যান, তাহারও ইতিহাস লিখিত হয়, কিন্তু বাঙ্গালার ইতিহাস নাই। গ্রীনলন্ডের ইতিহাস লিখিত হইয়াছে, মাওরি জাতির ইতিহাসও আছে, কিন্তু যে দেশে গৌড়, তাম্রলিপ্তি, সপ্তগ্রামাদি নগর ছিল, যেখানে নৈষধচরিত, গীতগোবিন্দ লিখিত হইয়াছে, যে দেশ উদয়নাচার্য্য, রঘুনাথ শিরোমণি ও চৈতন্যদেবের জন্মভূমি, সে দেশের ইতিহাস নাই।"[২৮]

ভারতবর্ষের ইতিহাসহীনতার কারণের সঙ্গে বাংলাদেশের ইতিহাসহীনতার কারণকে বঙ্কিমচন্দ্র একত্রিত করে দেখেছেন। তাঁর মতে এই ইতিহাসহীনতার কারণ প্রধানত দুটি — (১) ঘোরতর দেবভক্তি, (২) অত্যন্ত দৈবপ্রীতি। অত্যন্ত বিনীত মানসিকতার কারণে প্রাচীন ভারতীয়রা ইতিহাসহীন। পক্ষান্তরে জাতীয় গৌরবের গর্ব হেতু ইউরোপীয়দের ইতিহাসের বাহুল্য।

'বাঙ্গালার ইতিহাস' প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র অনেকগুলি অবশ্য জ্ঞাতব্য ও নতুন বিষয়ের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন :-

প্রথম। বাঙালি জাতি 'ঔপনিবেশিকতায়' এথেনীয়দের তুল্য ছিল। ভারতবর্ষের আর কোনো জাতি এমন 'ঔপনিবেশিকতা' দেখাতে পারেনি। যবদ্বীপ ও বালিদ্বীপে বাঙালি উপনিবেশ বিস্তার করেছিল এবং সিংহল বাঙালি কর্তৃক অধিকৃত হয়েছিল। যদিও বাঙালির সিংহল বিজয় নিয়ে বিতর্ক আছে। রমেশচন্দ্র মজুমদার বিজয় সিংহের সিংহল বিজয় কাহিনীকে কাল্পনিক বলেছেন।[২৯]

দ্বিতীয়। বাঙালি রাজারা অনেক সময় উত্তর ভারতে বৃহৎ সাম্রাজ্যের অধীশ্বর ছিলেন। পালবংশের দেবপাল দেব ভারতবর্ষের ইতিহাসে সম্রাট বলে কীর্তিত। লক্ষ্মণ সেন, বারাণসী, প্রয়াগ এবং শ্রীক্ষেত্র জয় করেছিলেন। বাঙালিরা গঙ্গাবংশ পরিচয়ে বহুকাল উড়িষ্যায় রাজত্ব করেছেন। এ সব থেকে প্রমাণিত হয় যে, প্রাচীন কালে বাঙালি গৌরবহীন

ও ক্ষুদ্র জাতি ছিল না।

তৃতীয়। সপ্তদশ পাঠান কর্তৃক বঙ্গজয় হয়েছিল — এ কলঙ্ক মিথ্যা। সপ্তদশ পাঠান কর্তৃক কেবল নবদ্বীপ রাজপুরী বিজিত হয়েছিল। বখ্‌তিয়ার খিল্‌জী ও তার সঙ্গী পাঠান সৈন্যরা নবদ্বীপ জয় করেছিল মাত্র। তারা কখনোই বাংলাদেশকে সম্পূর্ণ রূপে জয় করতে পারেনি।[৩০] নবদ্বীপ জয়ের পরেও বহুদিন পর্যন্ত সেনবংশীয়রা পূর্ব ও দক্ষিণ বাংলার অধিপতি থেকে স্বাধীন ভাবে সপ্তগ্রাম ও সুবর্ণগ্রামে রাজত্ব করেছেন। সপ্তদশ অশ্বারোহী কর্তৃক বঙ্গবিজয়ের কাহিনী যে মিথ্যা, এমত সর্বপ্রথম বঙ্কিমচন্দ্রই প্রকাশ করেছেন, আধুনিক কালে এ মত ঐতিহাসিক গবেষণায় সমর্থিত। [৩১]

চতুর্থ। বঙ্কিমচন্দ্রের মতে পাঠান রাজত্বকালে বাংলাদেশ ছিল 'স্বতন্ত্র ও স্বাধীন'। এ কারণে পরাধীন রাজ্যের যে দুর্দশা ঘটে, স্বাধীন পাঠানদের রাজত্বকালে বাংলাদেশের সে দুর্দশা ঘটেনি। পরাধীনতার একটি প্রধান ফল এই যে, এতে জাতির মানসিক স্ফূর্তি নির্বাপিত হয়, কিন্তু পাঠান রাজত্বকালে বাঙালির মানসিক স্ফূর্তি সর্বাপেক্ষা বেশী উজ্জ্বল হয়েছিল। হুসেন শাহের রাজত্বকালে বাংলা ঐশ্বর্যপূর্ণ দেশ ছিল। পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যেই বাঙালির শ্রেষ্ঠ কবিদ্বয় বিদ্যাপতি [৩২] ও চণ্ডীদাস, অদ্বিতীয় নৈয়ায়িক রঘুনন্দন, চৈতন্যদেব, বৈষ্ণব গোস্বামীবৃন্দ আবির্ভূত এবং তাঁদের গ্রন্থাবলী রচিত। আধুনিক কালেও এই যুগকে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে 'সুবর্ণ যুগ' হিসাবে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। প্রকৃতপক্ষে ইলিয়াসশাহী ও হুসেনশাহী আমলে বাঙালির বিদ্যাচর্চা, সৃজনশীল সাহিত্য শিল্প-কলা ও স্থাপত্যের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি ঘটেছিল।

পঞ্চম। পাঠান রাজ বাংলার মিত্র আর মোঘল বাংলার শত্রু। কারণ, মোঘল আমলেই বাংলার শ্রীহানি এবং বাঙালির অধঃপতনের সূচনা হয়। এই সময়ে বাংলাদেশ স্বাধীনতা হারিয়ে করদ রাজ্যে পরিণত এবং বাংলার ধন বাংলায় না থেকে দিল্লীর পথে চালিত হয়। মোগলের সব কীর্তি উত্তর ভারতে, বাংলায় মোঘলের কোন কীর্তি নেই। উত্তর ভারতের কীর্তির অর্থও বাংলাদেশ থেকে সংগৃহীত। এ সময়ে বাঙালি জাতির মানসিক স্ফূর্তি নির্বাপিত হয়েছিল, ফলে কোনো ভাল কবি ও শাস্ত্রবেত্তার আবির্ভাব হয়নি বা কোনো ভাল গ্রন্থ রচিত হয়নি।

বঙ্কিমচন্দ্র যেমন বাঙালির 'মানসিক উদ্দীপ্তি'র কারণে পাঠান শাসনের প্রতি কৃতজ্ঞ ছিলেন, তেমনি সেই রেনেশাঁসের আলোক নির্বাপিত হওয়ার কারণেই মোঘল শাসনের প্রতি ছিলেন অত্যন্ত বীতশ্রদ্ধ। এ বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের অভিমতের সমর্থন পাওয়া যায় আধুনিক ভারতীয় ইতিহাসবিদ্ তপন রায় চৌধুরীর রচনায়। তাঁর মতে — "Mughal rule in Bengal preserved its character of a foreign conquest. The Viceroys and Officers came and went without taking any real interest in the life of the province. A considerable part of the resources of the land was drained away to upper India in the form of presents or cash tributes." [৩৩] এ বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে ড: ভবতোষ দত্ত যথার্থই বলেছেন — "বঙ্কিমচন্দ্রের এই উক্তির সারবত্তা আমরা বুঝতে পারি যখন ভেবে দেখি মোঘল শাসনে সত্যই বাঙালীর মনের ক্ষেত্রে কোন নবীন শস্য জন্মেনি; শুধু পূর্বে উদ্ভাবিত শস্যের বীজ বপন করে যাওয়া হয়েছে মাত্র। পূর্ববর্তী কাব্যের আদর্শের অনুসরণে বহিরঙ্গ - পরিপাট্যে মনোহর করে মঙ্গলকাব্য এবং বৈষ্ণব কাব্যের দুই ধারা চলে আসে। ধর্মের দিক দিয়েও বৈষ্ণব ধর্মের উদ্দীপনা স্তিমিত হয়ে শক্তিধর্মের প্রান্তরে পথ হারায়।" [৩৪]

বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা

'বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা' প্রবন্ধের সূচনায় বাঙালির ভবিষ্যৎ চিন্তায় ব্যাকুল বঙ্কিমচন্দ্র বেদনাহত কণ্ঠে বলেছেন — "যে জাতির পূর্বমাহাত্ম্যের ঐতিহাসিক স্মৃতি থাকে, তাহারা মাহাত্ম্যরক্ষার চেষ্টা পায়, হারাইলে পুন:প্রাপ্তির চেষ্টা করে। ক্রেসী ও আজিনকুরের স্মৃতির ফল ব্লেনহিম্ ও ওয়াটালু — ইতালি অধ:পতিত হইয়াও পুনরুত্থিত হইয়াছে। বাঙ্গালী আজকাল বড় হইতে চায়, — হায় ! বাঙ্গালীর ঐতিহাসিক স্মৃতি কই ?" [৩৫]

বঙ্কিমচন্দ্রের আকাঙ্ক্ষা ছিল যে, বাঙালি জাতি একদিন তার লুপ্ত আত্ম-চেতনা ও প্রাচীন গৌরববোধ নিয়ে পুনরায় জেগে উঠবে। এই জাগরণের জন্য প্রয়োজন জাতির ইতিহাস। কিন্তু বাঙালির ইতিহাস না থাকায় বঙ্কিমচন্দ্র আর্তকণ্ঠে বলেছেন — "বাঙ্গালার ইতিহাস চাই। নহিলে বাঙ্গালী কখন মানুষ হইবে না। যাহার মনে থাকে যে, এ বংশ হইতে কখন মানুষের কাজ হয় নাই, তাহা হইতে কখন মানুষের কাজ হয় না। তাহার মনে হয়, বংশে রক্তের দোষ আছে। তিক্ত নিম্ব বৃক্ষের বীজে তিক্ত নিম্বই জন্মে — মাকালের বীজে মাকালই ফলে। যে বাঙ্গালীরা মনে জানে যে, আমাদিগের পূর্বপুরুষ চিরকাল দুর্বল — অসার, আমাদিগের পূর্বপুরুষদিগের কখন গৌরব ছিল না, তাহারা দুর্বল অসার গৌরবশূন্য ভিন্ন অন্য অবস্থা প্রাপ্তির ভরসা করে না — চেষ্টা করে না। চেষ্টা ভিন্ন সিদ্ধিও হয় না।"[৩৬] রবীন্দ্রনাথও একই ভাবে বলেছেন — "ইংরাজের ছেলে জানে, তাহার বাপ-পিতামহ অনেক যুদ্ধজয়, দেশ-অধিকার ও বাণিজ্য ব্যবসায় করিয়াছে ; সেও নিজেকে রণগৌরব, ধনগৌরব রাজ্যগৌরবের অধিকারী করিতে চায়। আমরা জানি, আমাদের পিতামহগণ দেশ অধিকার ও বাণিজ্য-বিস্তার করেন নাই। .... তাঁহারা কি করিয়াছিলেন জানি না, সুতরাং আমরা কি করিব তাহাও জানি না।"[৩৭]

প্রকৃতপক্ষে বাঙালি চিরকাল দুর্বল, অসার, গৌরবশূন্য জাতি নয়, এবং সে কারণেই বঙ্কিমচন্দ্রের বক্তব্য, বাঙালি যদি চিরকাল দুর্বল, অসার ও গৌরবশূন্য হত, "তাহা হইলে গণেশের রাজ্যাধিকার ; চৈতন্যের ধর্ম ; রঘুনাথ, গদাধর, জগদীশের ন্যায় ; জয়দেব, বিদ্যাপতি, মুকুন্দদেবের কোথা হইতে আসিল ? দুর্বল, অসার, গৌরবশূন্য আরওত জাতি পৃথিবীতে অনেক আছে। কোন্ দুর্বল অসার গৌরবশূন্য জাতি কথিতরূপ অবিনশ্বর কীর্তি জগতে স্থাপন করিয়াছে ? বোধ হয় না কি যে, বাঙ্গালার ইতিহাসে কিছু সার কথা আছে ?"[৩৮]

বাঙ্গালার ইতিহাসের সেই 'সার কথা' ইংরেজ অথবা মুসলমানের ইতিহাসে পাওয়া সম্ভব নয়। উদাহরণ স্বরূপ বঙ্কিমচন্দ্র মিন্‌হাজ-উদ্-দীন কথিত সপ্তদশ অশ্বারোহী কর্তৃক বঙ্গজয়ের কাহিনীর প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের মতে সপ্তদশ

অশ্বারোহী কর্তৃক বঙ্গজয়ে কাহিনী মিথ্যা। কারণ, সতের জন অশ্বারোহী মিলে লক্ষ লক্ষ বাঙালিকে বিজিত করল, এ কাহিনী প্রকৃতির নিয়ম বিরুদ্ধ এবং "আরিস্টটল হইতে মিল পর্যন্ত সকলে প্রাকৃতিক নিয়মের বিরুদ্ধে বিশ্বাস করিতে নিষেধ করিয়াছেন। .... বাস্তবিক সপ্তদশ অশ্বারোহী লইয়া বখতিয়ার খিলিজি যে বাঙ্গালা জয় করেন নাই তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে।"[১৯] এ বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্র বিস্তৃত আলোচনা করেছেন 'মুসলমান কর্তৃক বাঙ্গালা বিজয়' প্রবন্ধে।

'বাঙ্গালার ইতিহাসে কিছু সার কথা' ছিল, কিন্তু ইতিহাস ছিল না। বাঙালি কর্তৃক বাঙ্গলার ইতিহাস রচিত হয়নি ; তাই বাংলার প্রকৃত ঐতিহাসিক চিত্র পাওয়া যায় না। বঙ্কিমচন্দ্র চাইতেন যে, বাঙালি কর্তৃক বাংলার প্রকৃত ইতিহাস রচিত হোক। এই কারণে তিনি সকল বাঙালিকে বাংলাদেশের ইতিহাস রচনায় উদ্যোগী হতে আহ্বান জানিয়েছেন। অনেকে বুঝতে পারেন না যে, কোন্ পথে, কি ভাবে অনুসন্ধান করে ইতিহাস রচনা করতে হবে ; বঙ্কিমচন্দ্র তাঁদের জন্য বাঙ্গলার ইতিহাস রচনার একটি পথ নির্দেশিকা দিয়েছেন। বঙ্কিমচন্দ্র কথিত বাংলার ইতিহাস রচনার পথনির্দেশিকাকে আমরা নিম্নরূপে সাজাতে পারি :-

১। বাঙালি জাতির উৎপত্তি বিচার।

২। বাংলায় আর্য অধিকার বিস্তারের ইতিবৃত্ত।

৩। আদিশূরের আগে বাংলার রাজনৈতিক মানচিত্র।

৪। পাল ও সেন রাজ্য একত্রীকৃত হওয়ার ইতিবৃত্ত।

৫। মুসলমান কর্তৃক বঙ্গ বিজয়ের পূর্ব পর্যন্ত 'এই বৃহৎ সাম্রাজ্যের' অবস্থা ; রাজ্যশাসন, শান্তিরক্ষা, সামরিক শক্তি, জন প্রশাসন, রাজস্ব-পদ্ধতি, বিচার ব্যবস্থা, ধর্ম ও দর্শন চর্চা, শিক্ষা ও শাস্ত্রালোচনা, মহৎ গ্রন্থ ও গ্রন্থকার পরিচয়, বাঙালির চরিত্রের উপর ঐ সব গ্রন্থের প্রভাব, সামাজিক পরিচয়, বিবাহ পদ্ধতি, বর্ণব্যবস্থা, অন্তর্বাণিজ্য ও বহির্বাণিজ্য, সমুদ্র যাত্রা পদ্ধতি, উপনিবেশ বিস্তার, আমদানি - রফতানি ও পণ্যসামগ্রীর বৃত্তান্ত।

৬। বাংলাদেশে প্রথম মুসলমান অভিযান। মুসলমানেরা কি ভাবে, বাঙ্গলাদেশের কতটুকু অধিকার করেছিল।

৭। বাংলাদেশে পাঠান শাসন ও তার বিশেষত্ব। হিন্দু রাজারা পাঠান রাজত্বে কার্যত স্বতন্ত্র ছিলেন। এই সব ছোট ছোট রাজ্য ও রাজবংশের ইতিহাস রচনা।

৮। ইউরোপের রেনেশাঁসের মত ষোড়শ শতকে বাংলা দেশেও একবার 'নবজাগরণ' হয়েছিল। এই নবজাগরণের প্রেরণা ও স্বরূপ অনুসন্ধান। এই 'মানসিক উদ্দিপ্তী' নির্বাপিত হবার কারণ অনুসন্ধান।

৯। বাংলা ভাষার উদ্ভবের ইতিহাস।

১০। পরিশেষে মোঘল শাসন — মোঘল শাসনের কুফল, তোডরমল্লের রাজস্ব ব্যবস্থার প্রতিক্রিয়া, মুর্শিদকুলি খাঁর সংস্কার, জমিদারী ব্যবস্থার উদ্ভব এবং মোঘল সাম্রাজ্যে তাদের অবস্থার সঙ্গে ওয়ারেন হেস্টিংসের সময়ের এবং উনিশ শতকের জমিদারদের অবস্থার তুলনা।

১১। দেশীয় লোকের স্বধর্ম ত্যাগ করে মুসলমান ধর্মগ্রহণ বাংলার ইতিহাসের এক গুরুতর তত্ত্ব। কোন্ শ্রেণীর মানুষ কোন্ সময়ে ধর্মান্তরিত হল এবং ধর্মান্তরিত হওয়ার কারণ অনুসন্ধান।

বাঙ্গালীর উৎপত্তি

বঙ্কিমচন্দ্র বাংলাদেশের ইতিহাস রচনার জন্য শুধুমাত্র পথ-নির্দেশ করেই তাঁর কর্তব্য সমাপন করেন নি। তিনি স্বয়ং সেই পথ অনুসরণ করে বাংলাদেশের ইতিহাস উদ্ধারে সচেষ্ট হয়েছেন। ইতিহাসের গোড়ার কথা জাতিতত্ত্ব। যে জাতির ইতিহাস আলোচিত হবে সে জাতির সঙ্গে অপরাপর কোন্ কোন্ জাতির মিশ্রন হয়েছে, বংশানুক্রমে তারা কিরূপ আকৃতি ও প্রকৃতির উত্তরাধিকারী তার আলোচনা ইতিহাসের প্রথম ভাগের বিষয়। 'বাঙ্গালীর উৎপত্তি' প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র বাঙালি জাতির উৎপত্তি অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ করেছেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের সময় পর্যন্ত এই জাতিবিভাগ করা হত ভাষাবিভাগ অনুসারে। স্বাভাবিক ভাবেই তিনি বাঙালির উৎপত্তি বিচারে ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণকে আশ্রয় করেছেন। তাঁর মতে — "কে আর্য্য, কে অনার্য্য ? ইহা নিরূপণ করিবার জন্য ভাষাতত্ত্বই প্রধান উপায়, ...। যাহার ভাষা আর্য্যজাতীয় ভাষা, সেই আর্য্যবংশীয়। যাহার ভাষা অনার্য্যভাষা, সেই অনার্য্যজাতীয় ....।" [৪০] এই সাধারণ বিচারে বাংলাভাষা আর্য-ভাষা হওয়ায় বাঙালি জাতিকে আর্যজাতি বলা যায়।

কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের মতে — "বাঙ্গালী অমিশ্রিত বা বিশুদ্ধ আর্য্য নহে।" [৪১] কারণ, এমন অনেক দেখা গেছে যে, কোনো কোনো জাতির ভাষা এক জাতীয় বংশ অন্য জাতীয়। এর কারণ, অনেক সময় বিজিত জাতি বিজয়ী জাতির ভাষা ও ধর্ম গ্রহণ করে বিজয়ী জাতিভুক্ত হয়েছে। " এমন উদাহরণ ইতিহাসে অনেক পাওয়া যায়। ফ্রান্সের বর্তমান ভাষা লাটিন-মূলক, কিন্তু ফরাসি জাতির অস্থিমজ্জা কেল্‌টীয় শোণিতে-নির্মিত। প্রাচীন গলেরা রোমকগণ কর্তৃক পরাজিত ও রোমকরাজ্যভুক্ত হইলে পর রোমীয় সভ্যতা গ্রহণ করে। এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে রোমীয় ভাষা অর্থাৎ লাটিন ভাষা গ্রহণ করে। যখন পশ্চিম রোমকসাম্রাজ্য ধ্বংস প্রাপ্ত হয়, তখন গল্‌দিগের মধ্যে লাটিনভাষাই প্রচলিত ছিল, পরে তাহারই অপভ্রংশ বর্তমানে ফরাসি ভাষা দাঁড়াইয়াছে। আইবিরিয়াতেও (স্পেন ও পর্টুগল্) ঐরূপ ঘটিয়াছিল। আমেরিকার কাফ্‌রি দাসদিগের বংশ প্রভুদিগের ভাষা অবলম্বন করিয়াছে, জাতীয় ভাষার পরিবর্তে ইংরেজী বা ফরাসি ব্যবহার করিয়া থাকে। অতএব ভাষা আর্য্যভাষা হইলেই আর্য্যবংশীয় বলা যাইতে পারে না — অন্য প্রমাণ আবশ্যক।" [৪২]

'অন্য প্রমাণ'-এর ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্র ভাষা ভিন্ন শারীরিক গঠনের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তাঁর এই গুরুত্ব আরোপকে আমরা তখনই গভীর ভাবে উপলব্ধি করতে পারি, যখন তিনি বলেন — "সকলেই জানে যে, আর্য্যেরা ককেশীয়বংশীয়। ককেশীয় বংশের মধ্যে আর্য্য ভিন্ন অন্য বংশও আছে, কিন্তু ককেশীয় বংশের অন্তর্গত নহে, এমন আর্যজাতি নাই। ককেশীয়দিগের লক্ষণ — গৌরবর্ণ, দীর্ঘ শরীর, মস্তক সুগঠন, হনুদ্বয় অনুন্নত। মোঙ্গলবংশ ককেশীয়দিগের হইতে পৃথক্। মোঙ্গলীয়েরা খর্বাকার, মস্তকের

গঠন চতুষ্কোণ, হনূদ্বয় অত্যুন্নত। যদি কোন জাতিকে এমন পাওয়া যায় যে, তাহাদিগের শারীরিক গঠন মোঙ্গলীয়, তবে সে জাতিকে কখন আর্য্য বলা যাইবে না। যদি দেখিতে পাই, সে জাতীয়ের ভাষা আর্য্যভাষা, তাহা হইলে এইরূপ বিবেচনা করিতে হইবে যে, তাহারা আদৌ অনার্যজাতি, আর্য্যদিগের সহিত কোন প্রকার সম্বন্ধ বিশিষ্ট হইয়া আর্য্যদিগের ভাষা গ্রহণ করিয়াছে। আবার যদি দেখি যে, সেই অনার্য্যজাতি কেবল আর্য্যভাষা নহে, আর্য্যধর্ম পর্য্যন্ত গ্রহণ করিয়া আর্য্যসমাজভুক্ত হইয়াছে – তখন বুঝিতে হইবে যে, এক জাতি অপর জাতিকে বিজিত করিয়া একত্র বাস করায় একের সঙ্গে অন্য মিশিয়া গিয়াছে। যদি আবার দেখি যে, এই বিমিশ্র জাতিদ্বয়ের মধ্যে আর্য্য উন্নত – অনার্য্য অবনত, তবে বিবেচনা করিতে হইবে যে, আর্য্যেরা জয়কারী, অনার্য্যেরাই বিজিত হইয়া আর্য্যসমাজের নিম্নস্তরে প্রবেশ করিয়াছে।"[৪৩]

এছাড়া আর্য-শূদ্রদের সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়েও বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন –"প্রথম, কে আর্য্য আর কে অনার্য্য, ইহা মীমাংসা করিবার দুইটি মাত্র উপায়। এক ভাষা, দ্বিতীয় আকার। দেখা যাইতেছে যে, কেবল ভাষার উপর নির্ভর করিয়া বাঙ্গালার ভিতরে ইহার মীমাংসা হইতে পারে না। কেন না, সকল বাঙ্গালী শূদ্রই আর্য্যভাষা ব্যবহার করিয়া থাকে। তবে আকারই একমাত্র সহায় রহিল। কিন্তু ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, কায়স্থ প্রভৃতি অনেক শূদ্রের আকার আর্য্যপ্রকৃত। কায়স্থে ও ব্রাহ্মণে আকার বা বর্ণগত কোন বৈসদৃশ্য নাই। আকারে প্রমাণ হইতেছে, কতকগুলি শূদ্র আর্য্যবংশীয়।"[৪৪]

আর্য আগমনের আগে বাংলাদেশে প্রথমে কোলবংশীয় অনার্যরা বসবাস করত, পরে দ্রাবিড়বংশীয় অনার্যরাও বসবাস শুরু করে। আর্যদের কাছে পরাজিত হয়ে তাদের একাংশ অরণ্য ও পর্বতে পালিয়ে যায় আর অপরাংশ আর্যদের অধীনতা স্বীকার করে, আর্যভাষা ও আর্যধর্ম গ্রহণ করে ক্রমে হিন্দুজাতি বলে গণ্য হয়। অনার্যজাতি যে নিজেদের অনার্যভাষা পরিত্যাগ করে আর্যভাষা ও আর্যধর্ম গ্রহণ করেছিল বঙ্কিমচন্দ্র তার কয়েকটি উদাহরণ দিয়েছেন। যেমন – হাজারিবাগ প্রদেশের 'বিদয়' জাতি, আসামের হিন্দু 'চুটীয়া' এবং 'কাছাড়িয়া', কোচবিহারের 'কোচ' জাতি, ত্রিপুরার পাহাড়ী অধিবাসী ইত্যাদি। এই সব তথ্য বঙ্কিমচন্দ্র Statistical Account of Bengal এবং

Dalton's Ethnology থেকে সংগ্রহ করেছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের সময়কার লোকগণনা থেকে জানা যায় যে, বাংলাদেশের জনসংখ্যার অর্ধেক মুসলমান, – এরা বাঙালি বটে কিন্তু আর্য নয়। বাংলা দেশের অসংখ্য নিম্নবর্ণের মানুষ – হাড়ি, ডোম, মুচি, কাওড়া, কৈবর্ত, জেলে, কোঁচ, পলি প্রভৃতি – এরাও আর্য নয়। বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন – "ব্রাহ্মণ অমিশ্রিত এবং বিশুদ্ধ আর্য্য সন্দেহ নাই; কেন না, ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণ হইতেই উৎপত্তি ভিন্ন সঙ্করত্ব সম্ভবে না, সঙ্করত্ব ঘটিলে ব্রাহ্মণত্ব যায়। বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয় বৈশ্য সম্বন্ধে ঐরূপ হইলে হইতে পারে, কিন্তু ক্ষত্রিয় বৈশ্য বাঙ্গালায় নাই বলিলেই হয়। অতি অল্প সংখ্যক বৈদ্য ও বণিক্‌গণকে বাদ দিলে দেখা যায় যে, বাঙ্গালী কেবল দুই ভাগে বিভক্ত, ব্রাহ্মণ ও শূদ্র।"[৪৫] তবে ব্রাহ্মণের সংখ্যা নিতান্ত অল্প এবং শূদ্রদের মধ্যে কিছু আর্যজাতীয় হলেও অধিকাংশ অনার্যজাতীয়।

বাঙালির উৎপত্তি বিচার করতে গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র যে স্থূল কথা আমাদের জানিয়েছেন, তা'হল – "প্রথম কোলবংশীয় অনার্য্য, তারপর দ্রাবিড়বংশীয় অনার্য্য, তারপর আর্য্য; এই তিনে মিশিয়া আধুনিক বাঙ্গালী জাতির উৎপত্তি হইয়াছে। সাক্‌সন্, ডেন্ ও নর্মান মিশিয়া ইংরেজ জন্মিয়াছে। কিন্তু ইংরেজের গঠনে ও বাঙ্গালীর গঠনে .... বিশেষ প্রভেদ আছে। — ইংরেজ একজাতি, বাঙ্গালীরা বহুজাতি।"[৪৬] সাক্‌সন্, ডেন্ ও নর্মান এই তিন জাতিই আর্যবংশীয় হওয়ায় এবং বিবাহাদির দ্বারা সম্পর্ক যুক্ত হয়ে পার্থক্য লুপ্ত হওয়ায় ইংরেজ এক জাতিতে পরিণত হয়েছে। কিন্তু ভারতীয় আর্যদের ধর্ম, বর্ণ ও আকারগত পার্থক্য থাকায় বাংলায় তিনটি জাতির পৃথক স্রোত মিলে মিশে একটি প্রবল প্রবাহে পরিণত হয়নি।

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর সমসাময়িক কালে বাঙালির মধ্যে চারটি জাতি লক্ষ্য করেছেন – (১) আর্য (২) অনার্য হিন্দু (৩) আর্যানার্য হিন্দু (৪) মুসলমান। এই চার ভাগ পরস্পর থেকে পৃথক পৃথক থাকে। বাঙালি জাতির উচ্চস্তরে শুধু আর্য। কিন্তু নিম্নস্তরে, যেখানে অধিকাংশ বাঙালি, সেখানে অনার্য, মিশ্রিত আর্য ও মুসলমান। তবে উপরের স্তরে প্রায় অমিশ্রিত আর্য থাকার ফলে দূর থেকে বাঙালি জাতিকে আর্য জাতি বলে বোধ হয়।

বাঙালির উৎপত্তি বিশ্লেষণ করে বঙ্কিমচন্দ্র যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন তারপর নতুন নতুন গবেষণার দ্বারা আরও অনেক নতুন তথ্য আবিষ্কৃত হয়েছে।[৪৭] কিন্তু, বাঙালি মিশ্রজাতি বা বহুজাতি সঙ্কর – বঙ্কিমচন্দ্রের এ অভিমত আজও মূল্য-হীন বলে প্রতিপন্ন হয়নি। তবে, ব্রাহ্মণ অমিশ্রিত আর্য – বঙ্কিমচন্দ্রে এ অভিমত আধুনিক নৃ-তাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিকেরা স্বীকার করেন না। ডঃ রমেশ চন্দ্র মজুমদার বলেন – "বাঙ্গলার ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ প্রভৃতি সমুদয় বর্ণভুক্ত হিন্দুর পূর্বপুরুষ, তাহারা যে বৈদিক আর্যগণ হইতে ভিন্নজাতীয় ছিলেন, এ বিষয়ে পন্ডিতগণের মধ্যে মতভেদ নাই।"[৪৮]

বঙ্কিমচন্দ্র মূলত ভাষাভেদে জাতিভেদ তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে বাঙালির উৎপত্তি বিচার করলেও এই তত্ত্বের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। পক্ষান্তরে আকৃতি-ভেদে জাতিভেদ তত্ত্বও সম্পূর্ণ ত্রুটিহীন নয়। কারণ, অনেক সময় বংশানুগত না হয়ে আবহাওয়ার প্রভাবে আকৃতির রূপান্তর হয়। বঙ্কিমচন্দ্র আশ্চর্য প্রতিভাবলে দ্বিবিধ দৃষ্টিকোণ থেকে বাঙালির উৎপত্তি বিচার করেছেন। বাঙালির উৎপত্তি বিচার ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের কৃতিত্বের উচ্চ প্রশংসা করে বিখ্যাত ইতিহাসবেত্তা ও নৃ-তত্ত্ববিদ রমপ্রসাদ চন্দ বলেছেন – "জাতিতত্ত্বের ক্ষেত্রে যাঁহারা আকৃতিশ্রী তাঁহারাও বঙ্কিমচন্দ্রের জাতি-তত্ত্ব বিষয়ক নিবন্ধের অনাদর করিতে পারেন না। জাতিবিভাগনের সিদ্ধান্তকে প্রমাণ সমন্বয়ের সূত্র ভিন্ন বেশী কিছু মনে করা কর্তব্য নয়। এইরূপ রচনাতে প্রমাণ বিচারের ও প্রমাণ বিন্যাসের পারিপাট্যই রচনার উৎকর্ষ সূচিত করে। প্রমাণবিচারে ও প্রমাণ বিন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্রকে অতুলনীয় বলিলে বোধ হয় বিশেষ অত্যুক্তি হইবে না।"[৪৯]

॥ বাঙ্গালার ইতিহাসের ভগ্নাংশ ॥

বঙ্কিমচন্দ্রের মতে কোন দেশের ইতিহাস লিখতে গেলে সে দেশের প্রকৃত যে সত্তা তা উপলব্ধি করা একান্ত দরকার। তা' না হলে কোনো দেশের যথার্থ ইতিহাস লেখা সম্ভব নয়। এই কারণেই ইংরেজরা বাঙ্গলা দেশের সার্থক ইতিহাস রচনায় ব্যর্থ হয়েছেন।

ইংরেজদের লিখিত ইতিহাস পড়তে বসে আমরা পড়ে থাকি যে, – পালবংশ, সেনবংশ বাঙ্গার রাজা ছিলেন, বখ্‌তিয়ার খিলজী বাঙ্গা জয় করলেন, পাঠানেরা বাঙ্গার রাজা হলেন ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু এ সবই ভ্রান্ত।

বঙ্কিমচন্দ্রের মতে পাল, সেন ও বখ্‌তিয়ারের সময় বাঙ্গা নামে কোনো রাজ্য ছিল না। পাল ও সেন গৌড়ের রাজা ছিলেন, বখ্‌তিয়ার খিলজী লক্ষ্মণাবতী জয় করেছিলেন। গৌড় বা লক্ষ্মণাবতী বাঙ্গার প্রাচীন নাম নয়। 'বাঙালি' বলে কোনো জাতি সেখানকার অধিবাসী ছিল না। আমরা যাকে এখন বাঙ্গা বলি, গৌড় বা লক্ষ্মণাবতী তার এক অংশ মাত্র। সে দেশে যারা বাস করত, তারা অন্যজাতির সঙ্গে মিশে আধুনিক 'বাঙালি' জাতিতে পরিণত হয়েছে। যেমন গৌড় বা লক্ষ্মণাবতী একটি রাজ্য ছিল তেমনি আরও অনেকগুলি পৃথক রাজ্য ছিল। সর্বত্র অনার্য জাতির বাসভূমি। ক্রমে আর্য প্রাধান্যে প্রথমে হয় এক ধর্ম ও এক ভাষা, তারপর শেষে একচ্ছত্রাধীন হয়ে আধুনিক বাঙ্গায় পরিণত হয়েছে। যেমন ফ্লোরেন্স বা মিলানের ইতিহাস লিখলে আধুনিক ইতালির ইতিহাস লেখা হয় না, বাঙ্গারও কতকটা তেমনি। তবে ইতালি বলে দেশ ছিল কিন্তু বাঙ্গা বলে কোন দেশ ছিল না। বাঙ্গার ইতিহাসের সূচনা মোগলের সময় থেকে। আর বাঙ্গা একচ্ছত্রাধীন হয়েছে ইংরেজের সময়ে।

বঙ্কিমচন্দ্রের এই বক্তব্যের পাশে আধুনিক যুগের একজন বিখ্যাত ঐতিহাসিকের মত উপস্থাপিত করলে বঙ্কিমচন্দ্রের বক্তব্যের সারবত্তা উপলব্ধি হবে। একালের ঐতিহাসিকের মতে – "প্রাচীন হিন্দু যুগে সমগ্র বাঙ্গা দেশের কোন একটি বিশিষ্ট নাম ছিল না। ইহার ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চল ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত ছিল। .... মুসলমান যুগেই সর্বপ্রথম এই সমুদয় দেশ একত্রে বাঙ্গা অথবা বাঙ্গালা নামে পরিচিত হয়। এই বাঙ্গা হইতেই ইউরোপীয়গণের 'বেঙ্গলা' (Bengala) ও 'বেঙ্গল (Bengal) নামের উৎপত্তি। মুঘল সাম্রাজ্যের যুগে 'বাঙ্গালা' চট্টগ্রাম হইতে গহি পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।"[৫০]

এই প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র উত্তর-পূর্ব বাঙ্গার ইতিহাস আলোচনা করে বলেছেন যে, এখন যেখানে 'কামরূপ' প্রাচীন কালে সেখানে 'প্রাক্‌জ্যোতিষ' নামে এক রাজ্য ছিল। এই রাজ্যের রাজা ভগদত্ত কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে দুর্যোধনের পক্ষে যুদ্ধ করেন। আইন-

আকবরীতে আছে যে, ভগদত্তের বংশের তেইশ জন রাজা এখানে রাজত্ব করেন। এক সময় এই কামরূপ রাজ্য অতি বিস্তৃত ছিল। আসাম, জয়ন্ত্যা, কাছাড়, ময়মনসিংহ, শ্রীহট্ট, রঙ্গপুর, জলপাইগুড়ি এই রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। এই রাজ্যের রাজা পৃথু-র রাজধানীর ভগ্নাবশেষ তম্মা নামে নদীতীরে, চাকলা ও বোদা পরগণা বৈকুণ্ঠপুরের মধ্যস্থলে পাওয়া গেছে।

কামরূপ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কিছুদিনের জন্য 'রঙ্গপুর' একটি পৃথক রাজ্য হয়েছিল। ধর্মপাল এই রাজ্যের প্রথম রাজা বলে বঙ্কিমচন্দ্র অনুমান করেছেন। তাঁর মতে এই পাল রাজারা ইউরোপের বুর্বোবংশের এবং এশিয়ার তৈমুরবংশের মত নানা দেশে রাজা ছিলেন। গৌড়ে পাল রাজা, মৎস্যে পলিরাজা, রঙ্গপুরে পালরাজা, কামরূপে পালরাজা ছিলেন। ধর্মপালের রাজধানীর ভগ্নাবশেষ ডিমলার দক্ষিণে পাওয়া গেছে। তার প্রায় একক্রোশ দূরে মীনাবতী গড় ছিল। ধর্মপালের সঙ্গে তাঁর ভ্রাতৃজায়া মীনাবতীর রাজ্যাধিকার নিয়ে বিবাদবাধে এবং জয়লাভ করে মীনাবতী তাঁর পুত্র গোপীচন্দ্রকে সিংহাসনে বসান।[৫১] কিন্তু প্রকৃত শাসন ক্ষমতা মীনাবতীর হাতেই ছিল।

গোপীচন্দ্রের পুত্র ভবচন্দ্রের পর মাত্র একজন পালবংশীয় রাজা কামরূপ-রঙ্গপুরের রাজা হন। পালবংশের পরে এই অঞ্চলে মেচ, গারো, কোচ, লেপ্চা প্রভৃতি অনার্য জাতির প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু কিছুদিন পরে আবার নতুন আর্যরাজবংশ শাসনক্ষমতা লাভ করে। এই নতুন রাজবংশের প্রথম রাজা নীলধ্বজ। নীলধ্বজ কামতাপুর নামে নগরী নির্মান করেন। এই নগরের ধ্বংসাবশেষ কোচবিহার রাজ্যে পাওয়া গেছে।

এই বংশের তৃতীয় রাজা নীলাম্বরের সময় রাজ্য সুবিস্তৃত হয়েছিল। কিন্তু গৌড়ের পাঠান রাজার সঙ্গে যুদ্ধে তিনি পরাজিত হন এবং তারপর এখানে আর্যশাসনের সমাপ্তি ঘটে। বঙ্কিমচন্দ্রের মতে পাঠান রাজ হুসেন শাহ রঙ্গপুরের কিছু অংশ অধিকার করেন, এবং রঙ্গপুরের বাকি অংশ ও কামরূপ অধিকার করে কোচেরা কোচবিহার রাজ্য স্থাপন করে।

।। মুসলমান কর্তৃক বাঙ্গালা জয় ।।

'মুসলমান কর্তৃক বাঙ্গালা জয়' প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন যে, যা এখন বাংলাদেশ নামে পরিচিত, মুসলমান আক্রমনের ঠিক আগে তা' কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল।[৫২] গৌড় বা লক্ষ্মণাবতী তাদের মধ্যে একটি রাজ্য। এ সব রাজ্য কেউ কারো অধীন ছিল না। তবে গৌড় এ সব রাজ্যের মধ্যবর্তী হওয়ায়, আর্যপ্রাধান্য হেতু বিদ্যালোচনা, বাণিজ্য প্রভৃতি সভ্যতার উপকরণে সমৃদ্ধশালী হওয়ায়, এবং বল্লাল সেন ও লক্ষ্মণসেন প্রভৃতি প্রবল প্রতাপ রাজাদের রাজত্বকালে সুবিস্তৃত রাজ্যে পরিণত হওয়ায় যথেষ্ট গৌরবযুক্ত ছিল।

এই গৌড়রাজ্যও সেনরাজাদের রাজত্বকালের শেষ দিকে দুইভাগে বিভক্ত হয়েছিল। একভাগে ছিল মালদহ, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, নদীয়া, রাজশাহী প্রভৃতি জেলা – যার রাজধানী ছিল লক্ষ্মণাবতী। অপর ভাগ পূর্বাঞ্চল, অর্থাৎ বঙ্গদেশ, সুবর্ণগ্রামের অধিকার-ভুক্ত ছিল। সেখানেও সেনরাজারা রাজত্ব করতেন। যদিও গৌড় প্রাচীন গৌরবে বড়, কিন্তু মুসলমান আক্রমনের সময় তা' গৌরবহীন ক্ষুদ্ররাজ্যে পরিণত হয়েছিল এবং সে রাজ্য একজন অশীতিপর বৃদ্ধ অক্ষম রাজার হাতে সুপক্ক ফলের মতো দুলছিল।

বঙ্কিমচন্দ্র বাংলাদেশের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যগুলিকে আর্যভূমি বলতে চান নি। কারণ, শাসকবর্গ আর্য হলেও প্রজাবৃন্দ ছিল অনার্য। তিনি সমসাময়িক সামাজিক অবস্থা বিচার করে বলেছেন যে, বৌদ্ধধর্ম আর্যদের তুলনায় সাম্যময় হওয়ায় ঐতিহাসিক প্রভাতে বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্মের প্রাবল্য ছিল। কিন্তু পালবংশের পরে সেনরাজারা পৌরাণিক ধর্ম স্থাপন করলেন। পৌরাণিক ধর্ম বৈষম্যময়। ফল জনসাধারণের মধ্যে ঐক্যবোধ হীনতা। তার প্রমাণ – মুসলমান আমলে বাংলার জনগণের এক বৃহৎ অংশ বৈষম্যময় পৌরাণিক ধর্ম ত্যাগ করে সাম্যময় মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করল। সেন রাজাদের রাজত্বের শেষভাগে রাষ্ট্রবন্ধনহীন, জাতীয় ঐক্যবোধহীন মানুষ দেশরক্ষায় যত্নবান না হওয়ায় গৌড়রাজ্য মুসলমান কর্তৃক বিজিত হল।

মুসলমানেরা লক্ষ্মণাবতী জয় করেছিল তাতে কোন সন্দেহই নেই। কিন্তু সপ্তদশ অশ্বারোহী বাংলা জয় করেছিল এই গল্পকথা বঙ্কিমচন্দ্র কখনোই বিশ্বাস করেন নি।

সপ্তদশ অশ্বারোহী কর্তৃক বঙ্গজয়ের মিথ্যা কলঙ্ক বঙ্কিমচন্দ্রের চিত্তকে গভীর ভাবে আলোড়িত করেছিল এবং এই কলঙ্ক ভঞ্জনের জন্য তিনি যথাসাধ্য যুক্তি-প্রমাণ উদ্ধার করেছেন। তাঁর বাংলার ইতিহাস সংক্রান্ত সকল প্রবন্ধেই প্রসঙ্গটি উত্থাপিত হয়েছে।

সপ্তদশ অশ্বারোহী কর্তৃক বঙ্গবিজয়ের কাহিনী যে বঙ্কিমচন্দ্রকে বিব্রত করত তা' আমরা 'বঙ্গে ব্রাহ্মণাধিকার – দ্বিতীয় প্রস্তাব' পাঠে উপলব্ধি করি। সেখানে তিনি বলেছেন – "বল্লালের দেড়শত বৎসর পরে মুসলমানগণ বঙ্গজয় করেন। তখন বঙ্গীয় আর্য্যগণের সংখ্যা অধিক সহস্র নহে, ইহা অনুমেয়। তখনও তাঁহারা এদেশে ঔপনিবেশিক মাত্র। সুতরাং সপ্তদশ অশ্বারোহী কর্তৃক বঙ্গজয়ের যে কলঙ্ক, তাহা আর্য্যদিগের কিছু কমিতেছে বটে।"[৫৩] এই বক্তব্যে বঙ্কিমচন্দ্রের আত্মরক্ষার ভঙ্গি আছে কিন্তু প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর অনুপস্থিত। অবশ্য সে কণ্ঠস্বর আমরা অন্যত্র শুনতে পাই – "সপ্তদশ পাঠান কর্তৃক বঙ্গজয় হইয়াছিল, এ কলঙ্ক মিথ্যা।"[৫৪]

এই বক্তব্যই তিনি একটু বিস্তৃত ভাবে বলেছেন 'বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা' প্রবন্ধে। তিনি বলেছেন – "সতের জন অশ্বরোহীতে বাঙ্গালা জয় করিয়াছিল, এ উপন্যাসের ঐতিহাসিক প্রমাণ কি ? মিন্‌হাজ উদ্দীন বাঙ্গালা জয়ের ষাট বৎসর পরে এই এক উপকথা লিখিয়া গিয়াছেন। .... সেই গোহত্যাকারী, ফৌরিতচিকুর, মুসলমানের স্বকপোলকল্পনের উপর তোমার বিশ্বাস। এ বিশ্বাসের আর কোন কারণ নাই, কেবল এই মাত্র কারণ যে, সাহেবেরা সেই মিনহাজ্‌উদ্দীনের কথা অবলম্বন করিয়া ইংরেজিতে ইতিহাস লিখিয়াছেন। তাহা পড়িলে চাকরী হয় ! বিশ্বাস বিশ্বাস না হইবে কেন ?"[৫৫]

'মুসলমান কর্তৃক বাঙ্গালা জয়' – এর কাহিনী আমরা প্রথম জানতে পারি আবু ওমর মিন্‌হাজ উদ্দীন জর্জাতি রচিত 'তবকাৎ-ই-নাসিরী' নামক একটি গ্রন্থ থেকে। মিন্‌হাজ যা লিখে রেখে গিয়েছেন বঙ্কিমচন্দ্র তার সারার্থ উদ্ধার করেছেন[৫৬] –

"৫৯৯ হেজিরা-অব্দে (ইং. ১২০২।৩) মুসলমানেরা বেহার জয় করিয়াছে এবং বাঙ্গালার সীমায় আসিয়া লুঠতরাজ আরম্ভ করিয়াছে দেখিয়া, বাঙ্গালার ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত ও জ্যোতির্বিদেরা রাজসমীপে উপস্থিত হইয়া নিবেদন করিল যে, পুরাণে এরূপ

ভবিষ্যদ্বাণী আছে যে, তুর্কিয়েরা বাঙ্গালা জয় করিবে। অতএব মহারাজ নিজ ধনসম্পত্তি, পৌরজন ও রাজধানী নবদ্বীপ হইতে এমন কোন নির্বিঘ্ন ও দূরবর্তী প্রদেশে লইয়া যান যে, সেখানে এই বৈরীবর্গের আক্রমণের কোন শঙ্কা না থাকে।

এই কথা শুনিয়া, রাজা ব্রাহ্মণগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, যে পুরুষ বাঙ্গালা জয় করিবে, পুরাণে তাহার কোন বর্ণনা আছে কি না। ব্রাহ্মণেরা উত্তর করিল – হাঁ আছে আর সে বর্ণন, বেহারে যে মুসলমান সেনাপতি নিযুক্ত আছে, তাহারই অনুরূপ।

রাজা তখন অতিশয় বৃদ্ধ, এবং নবদ্বীপের পক্ষবাদী। তিনি ব্রাহ্মণদিগের পরামর্শে কর্ণপাত করিলেন না, এবং বিপদ হইতে ত্রাণ পাইবার কোন উপায়ও করিলেন না। কিন্তু অমাত্যবর্গ এবং যত প্রধান ব্যক্তি, সকলেই আপন আপন পৌরজন ও ধন-সম্পত্তি 'জগন্নাথ প্রদেশে' (উড়িষ্যায়) অথবা গঙ্গার পূর্বোত্তর পারস্থিত প্রদেশে পাঠাইয়া দিল।

৬০০ হেজিরা অব্দে, (ইং ১২০৩।৪) মহম্মদ বখ্‌তিয়ার খিলজি বাঙ্গালার অরক্ষিত অবস্থার বিশেষ সম্বাদ পাইয়া গোপনে সৈন্যসংগ্রহ করিলেন। বেহার হইতে তিনি এমন সত্বর নবদ্বীপাভিমুখে যাত্রা করিলেন যে তাঁহার আগমন কেহ অনুমান করিতে পারিল না।

নগরের নিকটে আসিয়া তিনি এক বনমধ্যে সৈন্য লুক্কায়িত করিয়া রাখিয়া সপ্তদশমাত্র অশ্বারোহী সঙ্গে লইয়া নগরমধ্যে প্রবেশ করিলেন। নগর রক্ষিবর্গের নিকট উপস্থিত হইয়া জানাইলেন, যে তাঁহারা রাজদূত; নবদ্বীপাধিপতিকে প্রণাম করিতে যাইবেন। রক্ষিবর্গ তাঁহাদিগকে পুরী প্রবেশ করিতে অনুমতি দিল। পুরী প্রবিষ্ট হইয়া তাঁহারা অসি নিষ্কাষিত-পূর্বক রাজানুচরবর্গকে বধ করিতে লাগিল।

রাজা লাছমনীয়া তখন ভোজনে বসিয়াছিলেন। তিনি পৌরবর্গের আর্ত্তনাদ শুনিয়া, খড়্গদ্বার দিয়া, পুরী হইতে পলায়ন করিলেন। একখানা ডিঙ্গীতে চড়িয়া অতি দ্রুতবেগে নদী বাহিয়া গেলেন।

মুসলমান সেনার অবশিষ্ট ভাগ এক্ষণে আসিল। তাহারা কতকগুলি হিন্দুকে প্রাণে বধ করিয়া নগর ও পুরী অধিকার করিল।"[৫৭]

মিন্‌হাজের লেখা কাহিনী বিশ্লেষণ করে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন যে, সপ্তদশ পাঠানের বঙ্গজয় কাহিনী মিথ্যা। কারণ, প্রথমতঃ মিন্‌হাজ নিজেই লিখেছেন যে, অবশিষ্ট সেনা পরে এসে 'নগর ও পুরী অধিকার' করেছিল। সুতরাং সপ্তদশ অশ্বারোহী রাজ্য-জয় দূরে থাক, নগরজয় দূরে থাক, লক্ষ্মণাবতী রাজপুরীও জয় করতে পারেনি। বৃদ্ধ রাজা লক্ষ্মণসেন পালিয়েছিলেন বটে, কিন্তু রাজপুরীর রক্ষকেরা যুদ্ধ করে সেই সপ্তদশ অশ্বারোহীকে বিমুখ করেছিল। বঙ্কিমচন্দ্র বিদ্রূপ করে বলেছেন – "সপ্তদশ অশ্বারোহী কিছু করিতে পারে নাই – কেবল তাহারা মার্শম্যান প্রভৃতি স্থূলবুদ্ধি সাহেবদের মাথা ঘুরাইয়া দিয়াছে।"[৫৮]

দ্বিতীয়তঃ মিন্‌হাজ তাঁর বর্ণনার শেষে জানিয়েছেন যে, "বখ্‌তিয়ার এক বৎসরে বাঙ্গালাজয় সম্পন্ন করিলেন।"[৫৯] সুতরাং সপ্তদশ অশ্বারোহী যে বাংলা জয় করেনি তা' মিন্‌হাজের রচনাতেই প্রমাণিত।

তৃতীয়তঃ ঐতিহাসিক তথ্য বিচারে দেখা গেছে যে, বখ্‌তিয়ার এক বছরেও সমগ্র বাংলা জয় করতে পারেনি। বাংলা যে অনেকগুলি ছোট ছোট রাজ্যে বিভক্ত ছিল বখ্‌তিয়ার তার একটি মাত্র জয় করেছিল। যে রাজ্যটি জয় করেছিল, তার নাম লক্ষ্মণাবতী। প্রকৃত-পক্ষে পাঠানেরা কোনদিনই সমগ্র বাংলা জয় করতে পারেনি।

চতুর্থতঃ বঙ্কিমচন্দ্র আদৌ মিন্‌হাজউদ্দীনের কথা গ্রহণযোগ্য বলে স্বীকার করেন নি। কারণ, (১) মিন্‌হাজ সে সময়ের লোক নন, ফলে মুসলমানেরা যখন বাংলা জয় করেন সে সময়ে তিনি স্বয়ং বাংলাদেশে উপস্থিত ছিলেন না। (২) মিন্‌হাজ কোনো প্রামাণ্য গ্রন্থ অবলম্বনে এ কাহিনী বিবৃত করেন নি। (৩) তিনি কোনো বিশ্বস্ত সূত্র থেকেও এ কাহিনী সংগ্রহ করতে পারেন নি। সম্ভবত, মিন্‌হাজ, বাংলজয়ের যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী, কোন অতিবৃদ্ধ মুসলমান সৈনিকের কাছ থেকে 'মুসলমান কর্তৃক বঙ্গজয়'-এর কাহিনী সংগ্রহ করেছিলেন। সে বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের বক্তব্য – "ইং ১২৪৪ সালে, তৈমুর খাঁ ও তোখন খাঁ নামক দুইজন মুসলমানে বাঙ্গালার আধিপত্য লইয়া বিবাদ হয়। ইতিহাসে

পড়া যায়, মিন্‌হাজউদ্দীন মধ্যস্থ হইয়া রফা করিয়া দিয়াছিলেন। অতএব বাঙ্গাঁলা জয়ের ৪০ বৎসর পরে তিনি বাঙ্গাঁলায় আসিয়াছিলেন। এই ৪০ বৎসর পাঠানেরা নিয়ত যুদ্ধে বিব্রত ছিল। কতকগুলি যোদ্ধা, যদি চল্লিশ বৎসর অবিরাম যুদ্ধ করে, তবে তাহাদের মধ্যে কেহ জীবিত থাকিবে এমত সম্ভাবনা নাই। যুদ্ধেই সবাই মরিবে এমত বলিতেছি না। ইহা সম্ভব নহে, যে বখ্‌তিয়ার কতকগুলি অপোগন্ড শিশু বা কিশোর বয়স্ক কুমার লইয়া অপরিচিত দেশ জয় করিতে আসেন। অতএব তাঁহার সহচর যোদ্ধৃবর্গ, আর ৪০ বৎসরের মধ্যে সহজেই – কেবল মনুষ্যজীবনের ক্ষুদ্র আয়তন পূর্ণ হইল বলিয়াই – স্বর্গারোহণ করাই সম্ভব। তবে, যদি লড়াই ঝগড়া না থাকিত, তাহা হইলেও সত্তর আশী বৎসরের বুড়া দুই চারিজনকে পাওয়া গেলে যাইতে পারিত। কিন্তু যখন বঙ্গবিজেতা-দিগকে প্রতিবৎসর অসিহস্তে যুদ্ধে বাহির হইতে হইয়াছে, তখন চল্লিশ বৎসর পরে তাঁহাদিগের মধ্যে কাহাকেও পাওয়া যাইবে ইহা বড় সম্ভব নয়। ধরা যাউক, যে চল্লিশ বৎসর পরেও কেহ কেহ বাঁচিয়াছিল! যদি কেহ ছিল, তবে তাহাদের কথায় কতদূর বিশ্বাস করা উচিত? যদি কেহ বাঁচিয়া থাকে, তবে দুই একজন বুড়া মাত্র। বাঙ্গাঁলা জয়ের গল্পটা তাহাদের একচেটে মহল – কেহ প্রতিবাদ করিবার নাই। তারপর বুড়া বয়সে কিছু গালগল্পের শ্রীবৃদ্ধি – মনুষ্য মাত্রেরই এই স্বভাব। তারপর, গল্পটার বিষয় আপনাদের মরদানি – সেই বহুকাল অন্তর্হিত জোয়ানগির বাহাদুরি। তার উপর বিজিত, ঘৃণিত, শত্রুপদেস্থিত, কাফেরদের জব্দ করার কথা। সেই বুড়ারা যে আপনাদের কেরদানি না বাড়াইয়া, মিন্‌হাজউদ্দীনকে সত্য কথা বলিয়াছিল, যাহার বিশ্বাস হয় হৌক – আমি এমন বিশ্বাস করিব না।" [৬০]

মিন্‌হাজ কথিত বখ্‌তিয়ার খিলজির নদীয়া অভিযান কাহিনী আধুনিক কালের ইতিহাসিকবৃন্দ সম্পূর্ণ সত্যরূপে গ্রহণ করেন না। কারণ, প্রথমতঃ এই কাহিনী কোন লিখিত দলিল বা বিবরণের উপর ভিত্তি করে রচিত নয়। দ্বিতীয়তঃ সমসাময়িক আর কোনো ঐতি-হাসিক এই বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন নি। তৃতীয়তঃ এই কাহিনীর মধ্যে অনেক অবিশ্বাস্য ঘটনার সমাবেশ আছে। ফলে এই কাহিনীকে ঐতিহাসিক ঘটনার মর্যাদা দেওয়া যায় না। চতুর্থতঃ সপ্তদশ অশ্বারোহীর বঙ্গজয় কাহিনী অবিশ্বাস্য। বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায় 'প্রকৃতির নিয়ম বিরুদ্ধ', সুতরাং গ্রহণীয় নয়।

তবু এই কাহিনীকে সম্পূর্ণ অমূলক বলে পরিত্যাগ করা সঙ্গত নয়। খুব সম্ভব বখ্‌তিয়ার খিলজি ক্ষুদ্র একটি অশ্বারোহী বাহিনী নিয়ে বিহার থেকে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে অপ্রত্যাশিত ভাবে অতর্কিতে এই নগরী আক্রমন করেন এবং নগরী লুণ্ঠন করে ফিরে যান। এমন মনে করার কারণ, প্রথমতঃ ১২৫৫ খ্রিস্টাব্দে মুঘিসুদ্দিন উজবেক নদীয়া জয়ের চিহ্ন স্বরূপ যে মুদ্রা প্রচলিত করেন, তা থেকে অনুমান করা যায় যে, তার আগে নদীয়ায় তুর্কীশাসন স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। দ্বিতীয়তঃ কবি শরণ লিখেছেন যে, লক্ষ্মণ সেন এক ম্লেচ্ছ রাজাকে পরাজিত করেছিলেন। এ থেকে অনুমান হয় যে, পরবর্তী কালে লক্ষ্মণ সেন মুসলমান আক্রমন প্রতিহত করেন। তৃতীয়তঃ লক্ষ্মণসেনের দু'টি তাম্রশাসন থেকে প্রমাণিত হয় যে, ১২০৪ খ্রিস্টাব্দে বখ্‌তিয়ারের নদীয়া আক্রমনের পরেও লক্ষ্মণ সেন দু' বছর রাজত্ব করেন। ঐ তাম্রশাসনদুয়ে বাঙ্গালাদেশের গুরুতর রাষ্ট্রীয় পরিবর্তনের আভাস নেই। চতুর্থতঃ লক্ষ্মণসেনের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্রদ্বয়, বিশ্বরূপসেন ও কেশবসেন, সিংহাসনে বসেন। একটি তাম্রশাসনে তাঁদের 'যবনাম্বয়-প্রলয়-কাল-রুদ্র' বলা হয়েছে। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, সে সময়ে মুসলমানরা বঙ্গদেশ জয় করতে পারেনি।

পরিশেষে বলা দরকার যে, মুসলমানরা উত্তরবঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের কোনো কোনো অঞ্চলে প্রাধান্য বিস্তার করলেও পূর্ববঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গে সহজে প্রাধান্য বিস্তার করতে পারে নি। এই অঞ্চলে সেনবংশীয় রাজারা রাজত্ব করতেন। পূর্ববঙ্গে ১২৮৯ খ্রিস্টাব্দেও মধুসেন নামে একজন সেনবংশীয় রাজার রাজত্ব করার প্রমাণ পাওয়া গেছে। ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ-দশকের আগে মুসলমানেরা পূর্ববঙ্গের কোনো অংশ অধিকার করতে পারেনি। দক্ষিণবঙ্গ বিজিত হয়েছে ত্রয়োদশ শতাব্দীর পরে। এই প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন যে, ত্রয়োদশ শতাব্দীর কোনো মুসলমান ঐতিহাসিক বখ্‌তিয়ার খিলজিকে 'বঙ্গবিজেতা' বলেন নি। তাঁরা বখ্‌তিয়ার ও তাঁর উত্তরাধিকারীদের বিজিত রাজ্যকে কখনো 'বঙ্গরাজ্য' বলেন নি, বলেছেন 'লখনৌতি রাজ্য'। মিন্‌হাজউদ্দীন যখন ইতিহাসের তথ্য সংগ্রহের জন্য বঙ্গদেশে আসেন তখন 'বঙ্গদেশে' লক্ষ্মণসেনের বংশধরেরা রাজত্ব করছিলেন একথা মিন্‌হাজউদ্দীনই বলে গেছেন।

বঙ্কিমচন্দ্র অভিযোগ করেছেন যে, মুসলমান ঐতিহাসিকেরা স্বজাতির গৌরব-কীর্তন করতে গিয়ে অনেক স্থলেই ইতিহাসের প্রকৃত সত্য গোপন ও বিকৃত করেছেন। উদা-হরণ স্বরূপ প্রথমতঃ তিনি রাজপুতানার কথা বলেছেন। মুসলমানেরা রাজপুতদের হাতে

পুনঃ পুনঃ পরাভূত হয়েছে, কিন্তু কোনো মুসলমান ঐতিহাসিক সে কাহিনী লেখেন নি। সৌভাগ্যক্রমে রাজপুতদের ইতিহাস আছে এবং কর্ণেল টড রচিত **Annals and Antiquities of Rajathan** নামক বিখ্যাত গ্রন্থের মাধ্যমে সে ইতিহাস আমাদের জ্ঞানগোচর হয়েছে।

দ্বিতীয় উদাহরণ হিসাবে বঙ্কিমচন্দ্র দাক্ষিণাত্যের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন। ষোড়শ শতাব্দীর শেষার্ধে দাক্ষিণাত্য মুসলমানের সম্পূর্ণ অধিকারভুক্ত হইয়াছিল। কিন্তু তার আগে মুসলমানেরা পুনঃ পুনঃ পরাজিত হয়েছে। হিন্দুদের মুখোজ্জ্বলকারী মহারাজাধিরাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় কর্তৃক মুসলমানেরা পুনঃ পুনঃ পরাজিত ও বিতাড়িত হয়েছে। কৃষ্ণচন্দ্র যুদ্ধক্ষেত্রে একত্রে ৩৫,০০০ হাজার অশ্বারোহী এবং ৭,৩৩,০০০ হাজার পদাতিক সমবেত করেছিলেন। এ বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্র **Hunter's Orissa** গ্রন্থের বক্তব্যকে প্রামাণ্য বলে ধরেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের বক্তব্য — "পাঠান বা মোগল, মহারাষ্ট্র বা ইংরেজ, ভারতবর্ষে কেহ কখন আট লক্ষ সৈন্য এক যুদ্ধক্ষেত্রে সমবেত করিতে পারেন নাই। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য, ভারতবর্ষের মুসলমানি ইতিহাসে এই মুসলমানের যমদন্ড স্বরূপ মহাবীরপুরুষ সম্বন্ধে কি লেখা আছে ? আমি ফারসি জানি না, কিন্তু যতদূর অনুসন্ধান করিয়াছি তাঁহারা কৃষ্ণরায়ের নামও করেন নাই। এ সকল নাম করিয়া তাঁহারা লেখনীকে পাপগ্রস্ত করেন না। শেরসাহা বাঙ্গালার জয় করিলেন, তাহার ইতিহাস সেখজীরা লিখিয়া শেষ করিতে পারেন না — রাজা গণেশ বাঙ্গালা জয় করিলেন, তাহার ইতিহাস মোটে তিন ছত্র লিখিলেন।" [৬১]

তৃতীয় উদাহরণ — উড়িষ্যা। মুসলমানেরা পুনঃ পুনঃ উড়িষ্যা জয়ের চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছে। ১২৪৩ খ্রিস্টাব্দে তোঘন খাঁ উড়িষ্যা আক্রমন করেন। সে সময়ে কোণার্কের আশ্চর্য সূর্যমন্দির নির্মাণকারী গঙ্গাবংশীয় রাজা নরসিংহ দেব উড়িষ্যার সিংহাসনে আরূঢ় ছিলেন। তিনি তোঘন খাঁকে পরাজিত ও বিতাড়িত করেন এবং তোঘনের পশ্চাদধাবন করে গৌড় নগরী লুণ্ঠন করেন।

বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন — "কিন্তু মুসলমান ইতিহাসলেখক ফেরেশতা এই ঘটনা লইয়া বড় গোলে পড়িলেন। হিন্দুর হাতে মুসলমানের এ অপমান কি প্রকারে লেখেন ? বুদ্ধি খরচ করিয়া লিখিলেন, জঙ্গাস্ খাঁ তাঁহার অসংখ্য সেনা প্রবাহ লইয়া আসিয়া বাঙ্গালা জয় করিয়াছেন। ইতিহাসবেত্তার কৃপায়, যাজপুরের লাঙ্গুলীয় (নরসিংহ দেব)

পৃথিবী প্রমথনকারী জঙ্গীস্ খাঁ হইয়া গেল — উড়িষ্যার খন্ডাইতেরা মোগলসেনা হইয়া গেল। আর বাকি কি ?

এইত মুসলমানি ইতিহাস। মিন্হাজউদ্দীনও সেই গোষ্ঠী। তাঁহার কথার উপর নির্ভর করিয়া, কোন ঐতিহাসিক ঘটনার সত্যাসত্য নির্বাচন করা যাইতে পারে না। বখ্-তিয়ারের কামরূপের যুদ্ধের বিবরণে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, মিনহাজউদ্দীন উপন্যাস লেখক — ইতিহাস লেখক নহেন।" [৬২]

বঙ্কিমচন্দ্র ইংরেজ ইতিহাসবেত্তাদের বিরুদ্ধে প্রায় অনুরূপ অভিযোগ এনেছেন এবং ইংরেজের রচিত পলাশীযুদ্ধের কাহিনীকে তিনি 'সপ্তদশ অশ্বারোহীর আর এক এডিশন' [৬৩] বলে নিন্দা করেছেন।

বাঙ্গালার কলঙ্ক

'বাঙ্গালার কলঙ্ক' প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র বাঙালির দুর্বলতার ও ভীরুতার দুর-পনেয় কলঙ্ক অপনোদনে চেষ্টা করেছেন। তিনি বলেছেন যে, ভারতের যা কলঙ্ক বাংলারও সেই একই কলঙ্ক। তবে বাংলার কলঙ্ক অনেক গাঢ়। কারণ, কখনো কখনো ভারতবাসীর বাহুবলের প্রশংসা শুনতে পাওয়া যায়, কিন্তু বাঙালির বাহুবলের প্রশংসা কখনো শুনতে পাওয়া যায় না। "সকলেরই বিশ্বাস, বাঙালী চিরকাল ভীরু, চিরকাল স্ত্রী-স্বভাব, চিরকাল ঘুসি দেখিলেই পালাইয়া যায়।" [৬৪]

বাঙালি সম্পর্কে এ কলঙ্কের যাঁরা প্রচারক তাঁদের মধ্যে অন্যতম মেকলে। মেকলের প্রচার — **"The physical organisation of the Bengali is feeble even to effiminancy. He lives in a constant Vapour bath. His pursuits are sedentary, his limbs delicate, his movement languid .... perjury, forgery, are the weapons, offensive and defensive of the people of lower Ganges."** [৬৫]

মেকলের এই প্রচার বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে 'জাতীয় নিন্দা'রূপে প্রতিভাত হয়েছে। গভীর ক্ষোভের সঙ্গে তিনি লিখেছেন — "মেকলে বাঙ্গালীর চরিত্র সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন,

এরূপ জাতীয় নিন্দা কখনও কোন লেখক কোন জাতি সম্বন্ধে কলমবন্দ করে নাই। ভিন্ন দেশীয় মাত্রেরই বিশ্বাস যে, সে সকল কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। ভিন্নজাতীয়ের কথা দূরে থাকুক, অধিকাংশ বাঙালীরও এইরূপ বিশ্বাস। ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙালীর চরিত্র সমালোচনা করিলে, কথাটা কতকটা যদি সত্য বোধ হয়, তবে বলা যাইতে পারে, বাঙালীর এখন এ দুর্দশা হইবার অনেক কারণ আছে। মানুষকে মারিয়া ফেলিয়া তাহাকে মরা বলিলে মিথ্যা কথা বলা হয় না। কিন্তু যে বলে যে, বাঙালীর চিরকাল এই চরিত্র, বাঙালী চিরকাল দুর্বল, চিরকাল ভীরু, স্ত্রীস্বভাব, তাহার মাথায় বজ্রাঘাত হউক, তাহার কথা মিথ্যা।" [৬৬]

বঙ্কিমচন্দ্রের মতে বাঙালি পাঁচশ' বছর মুসলমানের অধীন ছিল বলে তাদের অসার ও গৌরবশূন্য বলা সঠিক নয়। কারণ, পৃথিবীর প্রায় সকল শ্রেষ্ঠ জাতিই কখনো না কখনো অপরের অধীন ছিল। যেমন ইংরেজ নর্মানের অধীন, জার্মান প্রথম নেপোলিয়নের অধীন, স্পেনীয়রা আটশ' বছর মুসলমানের অধীন ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন – "আরবদেশীয়েরা এক প্রকার দিগ্বিজয়ী। যখন যে দেশ আক্রমন করিয়াছে, তখনই তাহারা সেই দেশ জয় করিয়া পৃথিবীতে অতুল সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিল। তাহারা কেবল দুই দেশ হইতে পরাভূত হইয়া বহিষ্কৃত হয়। পশ্চিমে ফ্রান্স, পূর্বে ভারতবর্ষ। আরব্যরা মিশর ও শিরিয় দেশ মহম্মদের মৃত্যুর পর ছয় বৎসর মধ্যে, পারস্য দশ বৎসরে, অফ্রিকা ও স্পেন এক এক বৎসরে, কাবুল অষ্টাদশ বৎসরে, তুর্কস্থান আট বৎসরে সম্পূর্ণরূপে অধিকৃত করে।" [৬৭] কিন্তু "মুসলমানেরা সহজে বাঙালা জয় করে নাই – কেবল লক্ষ্মণাবতীই সহজে জয় করিয়াছিল। তাহারা তিন শত বৎসরেও সমস্ত বাঙালা জয় করিতে পারে নাই। মুসলমানেরা স্পেন্ হইতে ব্রহ্মপুত্র পর্য্যন্ত কালে সমস্ত অধিকার করিয়াছিল বটে, কিন্তু ভারতবর্ষ জয় করা তাহাদিগের পক্ষে যেরূপ দুরূহ হইয়াছিল, এমন আর কোন দেশই হয় নাই, ইহা 'ভারতকলঙ্ক' শীর্ষক প্রবন্ধে প্রমাণীকৃত হইয়াছে। ভারতবর্ষের মধ্যে আবার পাঁচটি জনপদে তাহারা বড় ঠেকিয়াছিল, এমন আর কোথাও না। ঐ পাঁচটি প্রদেশ – (১) পঞ্জাব, (২) সিন্ধুসৌবীর (৩) রাজস্থান (৪) দাক্ষিণাত্য (৫) বাঙালা।" [৬৮] সুতরাং বাঙালিকে স্ত্রীস্বভাব ও কাপুরুষ বলা চলে না।

বাংলার ইতিহাসচর্চার ক্ষেত্রে রাজেন্দ্র লাল মিত্রের মতকে (**Pala and Sena Dynasties of Bengal** ------ প্রবন্ধে প্রকাশিত) বঙ্কিমচন্দ্র প্রামাণিক এবং অখন্ডনীয় বলে স্থির করেছেন। তাঁর মতে পালবংশীয়েরা আগে বাংলার অধীশ্বর ছিলেন পরে সেনবংশীয়েরা বাংলার রাজা হন – এমত যথার্থ নয়। প্রকৃতপক্ষে উভয় বংশীয়েরা একই সময়ে রাজত্ব করতেন, তবে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে। সেনবংশীয়েরা পূর্ব-বাংলার সুবর্ণগ্রামের রাজা ছিলেন আর পালবংশীয়েরা আধুনিক মুঙ্গেরের রাজা ছিলেন। পরে সেনরাজারা পালরাজ্য অধিকার করে উভয় রাজ্যের অধীশ্বর হন।

বঙ্কিমচন্দ্র ক্ষোভের সঙ্গে বলেছেন যে, সেনাবাহিনীতে বাঙালি সিপাহীর স্থান হয় না, কিন্তু বিহারীরা উৎকৃষ্ট সিপাহী বলে পরিচিত। অথচ পূর্বাঞ্চলবাসী বাঙালিরা বিহার জয় করেছিলেন। সেনবংশীয়দের রাজত্ব বারাণসী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ভারতের সর্বাপেক্ষা প্রতাপান্বিত মগধরাজ্য বাঙালি কর্তৃক বিজিত ও অধিকৃত হয়েছিল। সুতরাং "বাঙ্গালীর চিরদুর্বলতার এবং চিভীরুতার আমরা কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ পাই নাই। কিন্তু বাঙ্গালী যে পূর্বকালে বহুবলশালী, তেজস্বী, বিজয়ী ছিল, তাহার অনেক প্রমাণ পাই।" [৬৯] এই বক্তব্যের সমর্থনে ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদারের উক্তি স্মরণীয় – "আজ আমরা জানিতে পারিয়াছি, বাঙালীর বাহুবল সত্য সত্যই একদিন তাহার গর্বের বিষয় ছিল। বাঙালী শশাঙ্ক কান্যকুব্জ হইতে কলিঙ্গ পর্যন্ত বিজয়াভিযান করিয়া যে সাম্রাজ্যের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, বাঙালী ধর্মপাল ও দেবপাল তাহার পরিকল্পনা সম্পূর্ণ করিয়া সুদূর পঞ্চনদ অবধি বাহুবলে বাঙালীর রাজশক্তি দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। বাঙালী ধর্মপাল কান্যকুব্জের রাজসভায় সম্রাটের আসনে বসিতেন, আর সমগ্র আর্যাবর্তের রাজন্যবৃন্দ প্রণত হইয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিতেন। গঙ্গাতীরে মৌর্য-সম্রাট অশোকের কীর্তিপূত পাটলিপুত্র নগরীর রাজসভায় ভারতের দূর-দূরান্তর প্রদেশ হইতে আগত সামন্ত রাজন্যবর্গ উপঢৌকনসহ নতশিরে দন্ডায়মান হইয়া পাল সম্রাটের প্রতীক্ষা করিতেন। ইহা স্বপ্ন নহে, সত্য ঘটনা। আজ বাঙালী ভীরু, দুর্বল বলে খ্যাত, ভারতের সামরিক শক্তিশালী জাতির পঙক্তি হইতে বহিষ্কৃত – কিন্তু আমাদের অতীত ইতিহাস মুক্তকন্ঠে ইহার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতেছে।" [৭০] আমরা যেন রমেশচন্দ্রের কন্ঠে বঙ্কিমচন্দ্রের বাণী শুনতে পাচ্ছি।

গ্রীকবীর আলেকজান্ডার ভারতত্যগের আগে তাঁর বিজিত রাজ্যাংশের শাসক নিযুক্তি করেছিলেন গ্রীক সেনাপতি সেলুকস নিকোটরকে। সেলুকস ভারতসম্রাট চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের দরবারে মেগাস্থিনিস নামক একজন গ্রীক রাজদূত প্রেরণ করেন। বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন যে, বিখ্যাত গ্রীক ইতিহাসবেত্তা মেগস্থিনিসের বিবরণ [৭১] থেকে আমরা 'গঙ্গারিড়ি' নামে এক জনপদের কথা জানতে পারি। বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন – "ঐ জনপদের স্থাননির্ণয়ে তিনি (মেগাস্থিনিস) এই রূপ লিখিয়াছেন যে, যেখানে গঙ্গা উত্তর হইতে দক্ষিণবাহিনী, সেইখানে গঙ্গা ঐ জনপদের পূর্বসীমা। .... এই রাজ্য এরূপ প্রতাপান্বিত ছিল যে, ইহা কখন কোন শত্রু কর্তৃক পরাজিত হয় নাই এবং অন্যান্য রাজগণ গঙ্গারাঢ়ীদিগের হস্তি-সৈন্যের ভয়ে তাহাদিগকে আক্রমন করিতেন না। তিনি (মেগাস্থিনিস) ইহাও লিখিয়াছেন যে, স্বয়ং সর্বজয়ী আলেকজান্ডার গঙ্গাতীরে উপনীত হইয়া গঙ্গারাঢ়ীদিগের প্রতাপ শুনিয়া, সেইখান হইতে প্রস্থান করিলেন। বাঙ্গালীর বলবীর্যের ভয়ে আলেকজান্ডার যুদ্ধে ক্ষান্ত হইয়াছিলেন, এ কথা কেহ বিশ্বাস করুন বা না করুন, ইহার সাক্ষী স্বয়ং মেগস্থিনিস। আমরা নূতন সাক্ষী শিখাইয়া আনিতেছি না।" [৭২]

ডঃ প্রভাত কুমার ঘোষ বলেছেন – "গঙ্গারিডিদের সঠিক অবস্থান কোথায় ছিল এই সম্পর্কে একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ সঙ্কেত ডিওডোরাস সিকিউলাসের (জন্ম খৃঃ পূঃ প্রথম শতাব্দী) একটি মন্তব্যের মধ্যে নিহিত আছে। বলাই বাহুল্য, এই উক্তিটি আলেকজান্ডার অথবা আলেকজান্ডারের পরবর্তী সময়ে কোন উৎপত্তিস্থলের সঙ্গে জড়িত। উক্তিটি এই রকম : –

> **'Now this river which (at its source) is 30 stadia broad, flows from north to south and emties its water into the ocean forming the eastern boundry of the Gangaridai, a nation which possess a vast force of largest size elephants. Owing to this their country has never been conquered by any foreign king; for all other nations dread the overwhelming number and strength of these elephants ....'**

এখানে যেমন গঙ্গারিডি রাষ্ট্রের অথবা জাতির একটা অস্পষ্ট ভৌগোলিক সীমা নির্দেশ করা হয়েছে, তেমনই তাদের সামরিক শক্তির গোপন সূত্রটির কথাও বলা হয়েছে। ডিওডোরাসের একই জবানিতে আমরা অন্য একটি বিষয়েও অবগত হই, যেমন –

> 'Alexander the Makedonian, after conquering all Asia, did not make war upon the Gangaridai, as he did all others; for when he arrived with all his troops at the river of Ganges, and had subdued all the other Indians, he abondoned as hopeless an invasion of the Gangaridai when he learned that they possessed four thousand elephants well trained and equipped for war'. (Ancient India as described by Megasthenes and Arrian - J.W.Mccrindle). [৭৩]

আধুনিক যুগে গঙ্গারিডি চিন্তার পথিকৃৎ হলেন বঙ্কিমচন্দ্র। এ বিষয়ে তিনি তাঁর পান্ডিত্যপূর্ণ সিদ্ধান্ত আমাদের জানিয়েছেন। তিনি সিদ্ধান্ত করেছেন যে, গঙ্গানদী যেখানে উত্তর থেকে দক্ষিণবাহিনী তা যদি গঙ্গারিডির পূর্বসীমা হয়, তবে ঐ জনপদ বর্তমান 'রাঢ়দেশ'। বঙ্কিমচন্দ্রের মতে মেগাস্থিনিসের 'Gangaridae' শব্দটি 'গঙ্গারাঢ়ী' শব্দের অপভ্রংশ মাত্র। 'রাঢ়' শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে 'রাষ্ট্র' শব্দ থেকে। যেমন – সুরাষ্ট্র থেকে সুরাট, মধ্যরাষ্ট্র থেকে মেবাড়, গুর্জরাষ্ট্র থেকে গুজরাট; তেমন – গঙ্গারাষ্ট্র থেকে গঙ্গারাট্ বা গঙ্গারাঢ়। কালক্রমে সংক্ষেপার্থ 'গঙ্গা' শব্দ বাদ গিয়ে শুধু 'রাট্' বা 'রাঢ়' শব্দের উৎপত্তি।

বঙ্কিমচন্দ্র আমাদের জানিয়েছেন যে, ম্যাকেঞ্জির সংগ্রহ নামে যে কতকগুলি দুর্লভ পুস্তক সংগ্রহ আছে, উইলসন সাহেব ঐ দুর্লভ পুস্তক সংগ্রহের একটি তালিকা এবং কিছু ঐতিহাসিক তত্ত্ব সংগ্রহ করে প্রকাশ করেছিলেন। উইলসন সাহেবের ঐতিহাসিক প্রমাণ সংগ্রহে একটি প্রস্তর শাসনের কথা আছে, যা থেকে জানা যায় যে, গঙ্গারাঢ়ীর অধীশ্বর অনন্তবর্মা বা কোলাহল কলিঙ্গ জয় করেন। ইঁতি বাঙালি ছিলেন। রাঢ়ী কোলাহলই

উড়িষ্যা বিজেতা এবং উড়িষ্যার গঙ্গাবংশের আদিপুরুষ।

উড়িষ্যার গঙ্গাবংশীয়দের সাম্রাজ্য গোদাবরী থেকে সরস্বতী পর্যন্ত অর্থাৎ বাংলার ত্রিবেণী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এখন যা মেদিনীপুর জেলা এবং হাবরা জেলা, তার সম্পূর্ণ এবং যা বর্ধমান ও হুগলী জেলার অন্তর্গত তার কিছু অংশ ঐ সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল।[৭৪] এই অঞ্চল গঙ্গাবংশীয়দের পৈতৃক রাজ্য। যেমন নর্মান উইলিয়ম্ ইংলন্ড জয় করে নর্মান্ডির রাজধানী ছেড়ে ইংলন্ডের রাজধানীতে গিয়ে বসবাস করতে লাগলেন, তেমন গঙ্গাবংশীয়েরা উড়িষ্যা জয় করে, নিজেদের প্রাচীন রাজধানী ছেড়ে উড়িষ্যায় বাস করতে লাগলেন বটে, কিন্তু তাঁরা পৈত্রিক রাজ্য ছাড়েন নি। খুব সম্ভব পরবর্তীকালে সেনরাজারা গঙ্গারাঢ়ীদের কাছ থেকে রাঢ়দেশের কিছু অংশ অধিকার করে নিয়েছিলেন।

ঐতিহাসিক ভারতবর্ষে যে সব রাজবংশের আবির্ভাব হয়েছিল, এই বাঙালি গঙ্গা-বংশীয়েরা প্রতাপ ও মহিমায় তাদের কারো থেকে ন্যূন ছিলেন না। বাংলার পাঠানেরা যতবার তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছে, ততবারই পরাজিত, বিতাড়িত ও অপমানিত হয়েছে। সুতরাং বাঙালির বলবিক্রমহীনতার অপবাদ মিথ্যা কলঙ্ক মাত্র।

বঙ্গদেশের কৃষক

'বঙ্গদেশের কৃষক' প্রবন্ধটি ইতিহাস বিষয়ক না হলেও এতে বঙ্কিমচন্দ্রের গভীর ইতিহাস নিষ্ঠার পরিচয় আছে। প্রবন্ধটি যখন তিনি 'বিবিধ প্রবন্ধ'-এ পুণর্মুদ্রিত করেন তখন পুণর্মুদ্রনের একাধিক কারণ প্রবন্ধটির সূচনাতে ব্যাখ্যা হিসাবে প্রদান করেন। তার প্রথম কারণ ব্যাখ্যায় তিনি লিখেছেন — "ইহাতে পঁচিশ বৎসর পূর্বে দেশের যে অবস্থা ছিল তাহা জানা যায়। ভবিষ্যৎ ইতিহাসবেত্তার ইহা কার্য্যে লাগিতে পারে।"[৭৫] ইতিহাস চেতনা বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের এই বক্তব্যের বিশ্লেষণ নিষ্প্রোয়জন।

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক ইতিহাস ও সেখানে কৃষকের স্থান নিয়ে বঙ্কিম-চন্দ্রের আগেও একাধিক প্রবন্ধ রচিত হয়েছিল। যেমন — ১৮৪৬ খ্রিস্টাব্দে প্যারীচাঁদ মিত্র রচিত 'The Zemindar and the Ryot', প্রবন্ধটি ক্যালকাটা রিভিউ

পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দে ইন্ডিয়ান ফিল্ড পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল কিশোরী চাঁদ মিত্রের 'The Ryot and the Zeminder' প্রবন্ধ। ১৮৬৪ খ্রিস্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্রের অগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত – 'Bengal Ryot : Their Rights and Liabilities (Being an Elementary Treaties on the Land of Landlord and Tenant) পুস্তক, ইত্যাদি।

১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে 'বঙ্গদেশের কৃষক' প্রবন্ধটি চার দফায় 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এটি "বুদ্ধির আলোকে উদ্ভাসিত দৃষ্টিতে এবং অননুকরণীয় ভাষায় তৎ-কালীন বাঙলা দেশের কৃষকদের দুরবস্থার"[৭৬] বিবরণ। এই প্রবন্ধ পাঠে আমরা তৎ-কালীন ভূমি-ব্যবস্থা, জমিদারদের অত্যাচার ও প্রজার দুর্দশার পরিচয় জানতে পারি। উনিশ শতকের বিশিষ্ট চিন্তানায়ক "বঙ্কিমচন্দ্রকে 'বঙ্গদেশের কৃষক'-এ একই সঙ্গে যে ভাবে পাওয়া যায়, অন্যত্র তেমন পাওয়া যায় না।"[৭৭]

'বঙ্গদেশের কৃষক' প্রবন্ধের সূচনাতেই বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন যে, সাধারণ বিচারে ইংরেজ রাজত্বে দেশের মঙ্গল হচ্ছে। কিন্তু সেই সঙ্গে প্রশ্ন তুলেছেন যে, " .... কাহার এত মঙ্গল ? হাসিম শেখ আর রামা কৈবর্ত্ত দুই প্রহরের রৌদ্রে, খালি মাথায়, খালি পায়ে এক হাঁটু কাদার উপর দিয়া দুইটা অস্থিচর্মবিশিষ্ট বলদে, ভোঁতা হাল ধার করিয়া আনিয়া চষিতেছে, উহাদের কি মঙ্গল হইয়াছে ?[৭৮] বঙ্কিমচন্দ্রের মতে, অনুমাত্র না, কণামাত্রও না। যেহেতু বাংলার কৃষকের কোনো প্রকৃত মঙ্গল হয়নি, এবং যেহেতু এই কৃষকেরাই দেশের অধিকাংশ মানুষ, সেহেতু দেশের প্রকৃত কোনো মঙ্গল হয়েছে বলে বঙ্কিমচন্দ্র স্বীকার করেন নি। বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন – "আমরা এই প্রবন্ধে (বঙ্গদেশের কৃষক) একটি উদাহরণের দ্বারা প্রথমে দেখাইব যে, দেশের কি প্রকারে শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে। পরে দেখাইব যে, কৃষকেরা সে শ্রীবৃদ্ধির ভাগী নহে। পরে দেখাইব যে, তাহা কাহার দোষ।"[৭৯]

বঙ্কিমচন্দ্রের মতে ব্রিটিশ্ অধিকারে দেশ সুশাসিত। সুশাসনের ফল প্রজাবৃদ্ধি। প্রজাবৃদ্ধির ফল চাষ বৃদ্ধি। চাষবৃদ্ধির ফল উৎপাদন বৃদ্ধি। উৎপাদন বৃদ্ধির ফল বাণিজ্য-বৃদ্ধি। এবং সমুদয় ফল ধনবৃদ্ধি। কিন্তু এই ধনবৃদ্ধির ফলে বঙ্কিমচন্দ্র আনন্দিত হতে পারেন নি। কারণ, "অসাধারণ কৃষিলক্ষ্মী দেশের প্রতি সুপ্রসন্না। তাঁহার কৃপায় অর্থবর্ষণ

হইতেছে। সেই অর্থ রাজা, ভূস্বামী, বণিক্, মহাজন সকলেই কুড়াইতেছে। অতএব সেই শ্রীবৃদ্ধিতে রাজা, ভূস্বামী, বণিক্, মহাজন সকলেরই শ্রীবৃদ্ধি। কেবল কৃষকের শ্রীবৃদ্ধি নাই। সহস্র লোকের মধ্যে কেবল নয় শত নিরানব্বই জনের তাহাতে শ্রীবৃদ্ধি নাই। এমত শ্রীবৃদ্ধির জন্য যে জয়ধ্বনি তুলিতে চাহে তুলুক; আমি তুলিব না। এই নয় শত নিরানব্বই জনের শ্রীবৃদ্ধি না দেখিলে, আমি কাহারও জয় গান করিব না।"[৮০]

বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন – "জীবের শত্রু জীব; মনুষ্যের শত্রু মনুষ্য; বাঙ্গালী কৃষকের শত্রু বাঙ্গালী ভূস্বামী। ব্যাঘ্রাদি বৃহজ্জন্তু, ছাগাদি ক্ষুদ্র জন্তুগণকে ভক্ষণ করে; রোহিতাদি বৃহৎ মৎস্য, সফরীদিগকে ভক্ষণ করে; জমীদার নামক বড় মানুষ, কৃষক নামক ছোট মানুষকে ভক্ষণ করে। জমীদার প্রকৃত পক্ষে কৃষকদিগকে ধরিয়া উদরস্থ করেন না বটে, কিন্তু যাহা করেন, তাহা অপেক্ষা হৃদয়শোণিত পান করা দয়ার কাজ।"[৮১] জমিদারেরা কি ভাবে কৃষকের 'হৃদয়শোণিত পান' অপেক্ষা নিষ্ঠুর কাজটি করতেন তা' ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র 'ইন্ডিয়ান অবজর্বর' পত্রিকা থেকে উপাদান সংগ্রহ করে আমাদের সামনে উপস্থিত করেছেন।

বাংলা ১২৭৮ সন, প্রবল বন্যার সময়, একটি গ্রাম সমুদ্র মধ্যস্থ দ্বীপের মতো জলে ভাসছে, কৃষকদের ধান সব জলে ডুবে নষ্ট হয়েছে, গবাদি পশু সব অনাহারে মারা গেছে, প্রজারা নিজ নিজ প্রাণ বাঁচাতে শশব্যস্ত। এই দুঃখের সময়ে জমিদার প্রজাদের সাহায্য পাঠাবার পরিবর্তে প্রজাদের কাছ থেকে বাজে আদায়ের জন্য পাইক-পিয়াদা সহ গোমস্তা পাঠালেন। "গ্রামে মোটে ১২। ১৪ জন খোদকাস্ত প্রজা, এবং ১২। ১৪ জন কৃষাণ প্রভৃতি অপর লোক।"[৮২] গোমস্তা মহাশয় একটি তালিকা প্রস্তুত করে প্রজাদের কাছ থেকে ৫৪ টাকা ২ আনা আদায় করতে বসলেন। প্রজারা চেয়ে-চিন্তে, বেচে-কিনে, ধার-কর্জ করে টাকা সংগ্রহ করল। কিন্তু তার ৪।৫ দিন পরে আবার গোমস্তা মহাশয় বাবুদের মেয়ের বিয়ের জন্য ৪০ টাকা আদায় করার জন্য হাজির হলেন। নিরুপায় প্রজারা নীলকুঠি ও মহাজনের কাছে ধার চেয়ে বিফল হল।

"তখন অগত্যা প্রজারা শেষ উপায় অবলম্বন করিল – ফৌজদারিতে গিয়া নালিশ করিল। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব আসামীদিগকে সাজা দিলেন। আসামীরা আপিল করিল, জজ সাহেব বলিলেন, 'প্রজাদিগের উপর অত্যন্ত অত্যাচার হইয়াছে বটে, কিন্তু আইন

অনুসারে আমি আসামীদিগকে খালাস দিলাম।' সুবিচার হইল। কে না জানে, বিচারের উদ্দেশ্য আসামী খালাস ?

এটি উপন্যাস নহে। আমরা ইণ্ডিয়ান্ অবজর্বর হইতে ইহা উদ্ধৃত করিলাম। দুষ্ট লোক সকল সম্প্রদায় মধ্যে আছে, দুই একজন দুষ্ট লোকের দুষ্কর্ম উদাহরণ-স্বরূপ উল্লেখ করিয়া সম্প্রদায়ের প্রতি দোষারোপ করা অবিচার। যদি এ উদাহরণ সেরূপ হইত, তাহা হইলে ইহা আমরা প্রয়োগ করিতাম না। এ তাহা নহে — এরূপ ঘটনা সচরাচর ঘটিতেছে। যাঁহারা ইহা অস্বীকার করেন, তাঁহারা পল্লীগ্রামের অবস্থা কিছুই জানেন না।" ৮৩

প্রাচীন ভারতে জমিদার ছিল না, এবং প্রজাপীড়নও ছিল না। মধ্যযুগে, মুসলমানদের সময়ে, 'কর-সংগ্রহের কন্ট্রাক্টর' হিসাবে জমিদারের সৃষ্টি। জমিদারেরা রাজার রাজস্বের উপর যত বেশী আদায় করতে পারেন ততই তাঁদের লাভ। ফল প্রজাপীড়ন। তারপর ইংরেজ রাজত্বে প্রজার দুরবস্থা চরমে উঠল। লর্ড কর্ণওয়ালিস প্রজাদের গুরুতর সর্বনাশ করলেন। 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' দ্বারা তিনি 'কর সংগ্রহের কন্ট্রাক্টরদের' চিরস্থায়ী ভূস্বামী করলেন। "তাহাতে কি হইল ? জমীদারেরা যে প্রজাপীড়ক, সেই প্রজাপীড়ক রহিলেন। লাভের পক্ষে, প্রজাদিগের চিরকালের সত্ব একেবারে লোপ হইল। প্রজারাই চিরকালের ভূস্বামী; জমীদারেরা কস্মিন্‌কালে কেহ নহেন — কেবল সরকারী তহশীলদার। কর্ণওয়ালিস্ যথার্থ ভূস্বামীর নিকট হইতে ভূমি কাড়িয়া লইয়া তহশীলদারকে দিলেন। ইহা ভিন্ন প্রজাদিগের আর কোন লাভ হইল না। ইংরাজ-রাজ্যে বঙ্গদেশের কৃষকদিগের এই প্রথম কপাল ভাঙ্গিল। এই 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' বঙ্গদেশের অধঃপাতের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত মাত্র — কস্মিন কালে ফিরিবে না। ইংরাজদিগের এ কলঙ্ক চিরস্থায়ী; কেন না, এই বন্দোবস্ত 'চিরস্থায়ী'।" ৮৪

কৃষকদের অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করে বঙ্কিমচন্দ্র দেখিয়েছেন যে, সে সময়ে, জমিদার, আমলা, মহাজন প্রভৃতি সকলেই কৃষকদের শোষণ করত; আর সে জন্য তদানীন্তন ব্রিটিশ সরকার ও তার প্রশাসনই বহুলাংশে দায়ী ছিল। যদিও কৃষক, নির্ধারিত ভূমিরাজস্বের অধিক আদায়ের জন্য জমিদারদের বিরুদ্ধে আদালতের সাহায্য নিতে পারত, কিন্তু ব্রিটিশ সরকারের আইন ও বিচার-ব্যবস্থার চরিত্র বিশ্লেষণ করে বঙ্কিমচন্দ্র

দেখিয়েছেন যে, বাস্তবে তা সম্ভব ছিল না। বঙ্কিমচন্দ্রের মতে ব্রিটিশ সরকারের আইন ও বিচার ব্যবস্থা ছিল কৃষকের স্বার্থের প্রতিকূল এবং কৃষক শোষণের জন্য জমিদারের পক্ষে অনুকূল।

বঙ্কিমচন্দ্রের মতে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে ধনী জমিদার আরও ধনী এবং গরীব কৃষক আরও গরীব হয়েছে। 'বঙ্গদেশের কৃষক' প্রবন্ধের উপসংহারে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন – "পাঁচ সাত জন টাকার গাদায় গড়াগড়ি দিবে, আর ছয় কোটি লোক অন্নাভাবে মারা যাইবে, ইহা অপেক্ষা অন্যায় আর কিছু কি সংসারে আছে? সেই জন্যই কর্ণওয়ালিসের বন্দোবস্ত অতিশয় দূষ্য। প্রজাওয়ারি বন্দোবস্ত হইলে, এই দুই চারি জন অতিধনবান্ ব্যক্তির পরিবর্তে আমরা ছয় কোটি সুখী প্রজা দেখিতাম। .... এখন যে জন পাঁচ ছয় বাবুতে ব্রিটিশ্ ইন্ডিয়ান্ এসোসিয়েশনের ঘরে বসিয়া মৃদু মৃদু কথা কহেন, তৎপরিবর্তে তখন এই ছয় কোটি প্রজার সমুদ্রগর্জনগম্ভীর মহানিনাদ শুনা যাইত।

আমরা দেখাইলাম যে, যাঁহারা বিবেচনা করেন যে, জমীদার দেশের পক্ষে প্রয়োজনীয় বা উপকারী, তাহাদের তদ্রূপ বিশ্বাসের কোন কারণ নাই।" [৮৫]

'বঙ্গদেশের কৃষক' প্রবন্ধ থেকে বিভিন্ন উদ্ধৃতি সহযোগে আমরা যে আলোচনা করলাম তাতে বঙ্কিমচন্দ্র ধনী জমিদারদের পোষক এবং গরীব কৃষকদের দ্বেষক ছিলেন – এ মত প্রচার এক প্রকার অসম্ভব। কিন্তু সেই সঙ্গে আমরা বিস্মৃত হইনি যে, বঙ্কিম-চন্দ্র উনিশ শতকের চিন্তানায়ক। যে সময়ে, বাঙালি মনীষার চিন্তার জগতে, একটি স্ববিরোধিতা এবং গ্রহণ-বর্জনের ক্ষেত্রে একটি দ্বিধা কাজ করেছে; যার হাত থেকে স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্রও সম্পূর্ণ মুক্ত হতে পারেন নি। তার চিহ্ন 'বঙ্গদেশের কৃষক' প্রবন্ধে পাওয়া যায়। আমরা সেরকম মাত্র দুটি প্রসঙ্গ উত্থাপন করে 'বঙ্গদেশের কৃষক' সম্পর্কে আমাদের আলোচনা শেষ করব।

(১) ব্রিটিশ রাজত্বকালে ভূমিসংক্রান্ত যে সব আইন হয়েছে, তাতে পদে পদে প্রজার অনিষ্ট হয়েছে। প্রজার বল হরণ ও জমিদারের বলবৃদ্ধি হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রের মতে প্রজার এই অনিষ্ট সাধন, ইংরেজদের অনিচ্ছাকৃত ও ভ্রমাত্মক। তাই তিনি জমিদার কর্তৃক প্রজা শোষণ রদ করার জন্য ব্রিটিশ সরকারের কাছেই করুণ আবেদন করেছেন –

"আমরা এই দীন হীন ছয় কোটি বাঙ্গালী কৃষকের জন্য তাঁহাদের নিকট যুক্তকরে রোদন করিতেছি – তাঁহাদের মঙ্গল হউক। – ইংরাজরাজ্য অক্ষয় হউক। – তাঁহারা নিরুপায় কৃষকের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন।" [৮৬] কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র বিচারে ভুল করেছেন যে, যথাসম্ভব বর্ধিত ভূমিরাজস্ব আদায়ের জন্য ব্রিটিশ সরকারই এ ব্যবস্থার প্রবর্তক ও পৃষ্ঠপোষক।

(২) এ বিষয়ে সন্দেহের কোন কারণ নেই যে, প্রজার রক্তশোষণ করেই জমিদারের শ্রীবৃদ্ধি। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র সব ভূস্বামীকে কৃষকের শত্রু ভাবেন নি। তাঁর মতে অনেক জমিদার সদাশয়, প্রজাবৎসল ও সত্যনিষ্ঠ। তবে অত্যাচারী জমিদারও অনেক আছেন; তাঁদের শোধন করার জন্য তিনি 'ব্রিটিশ্ ইন্ডিয়ান্ এসোসিয়েশন্'-এর কাছে আবেদন করেছেন – "..... (জমিদার) সম্প্রদায়ভুক্ত কোন কোন লোকের দ্বারা যে প্রজা-পীড়ন হয়, ইহাই তাঁহাদিগের লজ্জাজনক কলঙ্ক। এই কলঙ্ক অপনীত করা জমিদারদিগেরই হাত। ..... এ কথার প্রতি মনোযোগ করিবার জন্য আমরা ব্রিটিশ্ ইন্ডিয়ান্ এসোসিয়েশনকে অনুরোধ করি।" [৮৭] আমরা মনে করি যে, জমিদারদের স্বার্থরক্ষার জন্য গঠিত সভার কাছে জমিদারের স্বার্থবিরোধী বিচারের দায়িত্ব দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র সুবিবেচনার কাজ করেন নি।

বাঙ্গালির বাহুবল

'বাঙ্গালির বাহুবল' প্রবন্ধটি ইতিহাস বিষয়ক প্রবন্ধ নয়। কিন্তু প্রবন্ধটি বঙ্গপ্রীতির প্রত্যক্ষ প্রেরণা থেকে রচিত এবং এই প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের ইতিহাস চেতনারও কিছু পরিচয় আছে।

ভারতের অন্যান্য প্রদেশবাসীদের বীরত্ব ও কীর্তি কথা আমরা ইতিহাস পাঠে জানি এবং তাদের কীর্তিচিহ্নও বর্তমান। কিন্তু বাঙালির কোনো কীর্তিকথা আমরা যেমন জানি না, তেমন কোনো কীর্তিচিহ্নও দেখি না। বাঙালির পূর্বগৌরব ও পূর্ববীরত্বের ইতিহাস নেই।

বঙ্কিমচন্দ্রের বঙ্গপ্রীতি ও বাঙালি প্রীতি গভীর, আত্মজাতির গৌরব প্রতিষ্ঠায়

তাঁর আগ্রহ অত্যন্ত প্রবল, কিন্তু ইতিহাসের সত্যের প্রতি তাঁর আনুগত্য প্রশ্নাতীত। তাই ইতিহাসের যুক্তি বিচারে তিনি যখন বলেন যে – দিল্লীতে বল্লালসেনের অধিকার ছিল, এ কাহিনী অমূলক; কাশীপ্রদেশ গৌড়েশ্বর মহীপালের রাজ্যভুক্ত ছিল, এমত গ্রহণযোগ্য নয়; এবং একটি তাম্রশাসনে লক্ষ্মণসেনকে যে সর্বদেশজেতা বলা হয়েছে, তা' চাটুকার কবির কল্পনা মাত্র; তখন, বঙ্কিমচন্দ্রের ইতিহাস চেতনা, সত্যনিষ্ঠার আলোকে আমাদের কাছে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন – "বাঙ্গালির এক্ষণে উন্নতির আকাঙ্ক্ষা অত্যন্ত প্রবল হইয়াছে। বাঙ্গালি সর্বদা উন্নতির জন্য ব্যস্ত। অনেকে তদ্বিষয়ে বিশেষ গুরুতর আশা করেন না। কেন না, বাঙ্গালির বাহুবল নাই।" [৮৮] বঙ্কিমচন্দ্রের মতে বাঙালির দুর্বলতার কারণ তিনটি – (১) জলসিক্ত তাপযুক্ত বায়ু – যা অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর, (২) খাদ্যাভাস – ভাত অতি অসার খাদ্য, (৩) বাল্যবিবাহ – অপ্রাপ্ত বয়স্ক পিতা-মাতার সন্তান প্রথমতঃ দুর্বল এবং দ্বিতীয়তঃ ইন্দ্রিয় সুখে নিরত অপ্রাপ্তবয়স্কের সবল হবার সম্ভাবনা কম।

বঙ্কিমচন্দ্রের মতে শারীরিক বল বাহুবল নয়। "উদ্যম, ঐক্য, সাহস এবং অধ্যবসায়, এই চারিটি একত্রিত করিয়া শারীরিক বল ব্যবহার করার যে ফল তাহাই বাহুবল। যে জাতির উদ্যম, ঐক্য, সাহস এবং অধ্যবসায় আছে, তাহাদের শারীরিক বল যেমন হউক না কেন, তাহাদের বাহুবল আছে। এই চারিটি বাঙ্গালির কোন কালে নাই, এজন্য বাঙ্গালির বাহুবল নাই।" [৮৯]

বাঙালির বাহুবল নেই, এ কথা সত্য। তবে, ভবিষ্যতে কখনো হবে না, একথা বলা যায় না। বাঙালির বাহুবল হবার সম্ভাবনা আছে, "যদি কখন (১) বাঙ্গালির কোন জাতীয় সুখের অভিলাষ প্রবল হয়, (২) যদি বাঙ্গালি মাত্রেরই হৃদয়ে সেই অভিলাষ প্রবল হয় (৩) যদি সেই প্রবলতা এরূপ হয় যে, তদর্থে লোকে প্রাণপণ করিতে প্রস্তুত হয়, (৪) যদি সেই অভিলাষের বল স্থায়ী হয়, তবে বাঙ্গালির অবশ্য বাহুবল হইবে।" [৯০] এই কথাই 'বাঙ্গালির বাহুবল' প্রবন্ধের সারকথা ও শেষকথা।

ইতিহাসের সংজ্ঞানির্ধারণ করতে গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন যে, – " ..... বস্তুতঃ যাহাতে পুরাবৃত্ত, অর্থাৎ পূর্বে যাহা ঘটিয়াছে, তাহার আবৃত্তি আছে, তাহা ভিন্ন আর কিছুকেই ইতিহাস বলা যাইতে পারে না।" [১১] কিন্তু এ ইতিহাস যে শুধুমাত্র সাম্রাজ্যের উত্থান-পতন, যুদ্ধ-বিগ্রহের বিবরণ, নবাব-বাদশা ও রাজা-মহারাজাদের জীবনচরিত মাত্র নয়; সাধারণ মানুষের জীবন-যাপন, সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা ও সামাজিক সমস্যাবলীর রূপায়ণও যে ইতিহাস, একথা বঙ্কিমচন্দ্র সুস্পষ্ট ভাবে ব্যক্ত করেছেন।

বিশুদ্ধ ভাষনচর্চার অভিপ্রায় নিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র ইতিহাসচর্চায় ব্রতী হন নি। দ্বিজেন্দ্রলাল নাথ লিখেছেন – " ..... প্রত্নতত্ত্ব, ইতিহাস ও অর্থনীতি সম্পর্কিত প্রবন্ধগুলিতে বঙ্কিমচন্দ্র যে প্রবল অনুসন্ধিৎসা ও প্রখর ইতিহাসচেতনার পরিচয় দিয়েছিলেন তা' ছিল মনীষীর গভীরতর সমাজচিন্তারই পরিচায়ক।" [১২] বঙ্কিমচন্দ্রের সমাজচিন্তা তাঁর ইতিহাস চিন্তাকে পরিপুষ্ট করেছিল বলেই তিনি 'বঙ্গদেশের কৃষক' রচনা করতে পেরেছিলেন এবং সামাজিক ইতিহাস রচনার প্রেরণায় তিনি রচনা করেছিলেন 'বাঙ্গালীর উৎপত্তি'। তিনি দেখাতে চেয়েছিলেন যে, সামাজিক ইতিহাস শুধুমাত্র উচ্চবর্ণের কীর্তি-কলাপ ও ধ্যান-ধারনার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। সাঁওতাল, হো, মুণ্ডা প্রভৃতি অনার্য; হাড়ি, ডোম, মুচি, জেলে প্রভৃতি নিম্নবর্ণের হিন্দু এবং মুসলমান সকলেই সামাজিক ইতিহাসের অঙ্গ এবং বাংলার সামাজিক ইতিহাসে এদের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে।

লোকবৃত্ত রচনার প্রতি বঙ্কিমচন্দ্রের আগ্রহ ছিল। প্রকৃতপক্ষে তিনিই প্রথম এ বিষয়ে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। 'বাঙ্গালার ইতিহাসের ভগ্নাংশ' প্রবন্ধে তিনি বহু প্রচলিত হবচন্দ্র রাজার গবচন্দ্র মন্ত্রীর কাহিনী বলেছেন এবং পরিশেষে মন্তব্য করেছেন – " এ ইতিহাস নহে – এ সত্যও নহে – এ পিতামহীর উপন্যাস মাত্র। তবে এ ঐতিহাসিক প্রবন্ধে এই অমূলক গালগল্প স্থান দিলাম কেন? এই কথাগুলি রাজার ইতিহাস নহে, লোকের ইতিহাস বটে। ইহাতে দেখা যায়, সে রাজপুরুষদিগের সম্বন্ধে এতদূর নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক গল্প বাঙ্গালীর মধ্যে প্রচার লাভ করিয়াছে। ভবচন্দ্র রাজা ও গবচন্দ্র পাত্রের দ্বারাও বাঙ্গালার রাজ্য চলিতে পারে, ইহা বাঙ্গালীর বিশ্বাস। যে দেশে এই সকল প্রবাদ চলিত, সে দেশের লোকের বিবেচনা এই যে, রাজা রাজড়া

সচরাচর ঘোরতর গন্ডমূর্খ হইয়া থাকে, হইলেও বিশেষ ক্ষতি নাই। বাস্তবিক এই কথাই সত্য। বাঙ্গালায় চিরকাল সমাজই সমাজকে শাসিত ও রক্ষিত করিয়া আসিয়াছে।"[১৩]

বঙ্কিমচন্দ্র বাংলাদেশের একটি গৌরবোজ্জ্বল সামাজিক ইতিহাস চেয়েছিলেন; কিন্তু বিদেশী ঐতিহাসিকদের ইতিহাসে তার পরিচয় না থাকায় ঐ সব ইতিহাস গ্রন্থ তাঁর কাছে আদরণীয় হয়নি। পক্ষান্তরে রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের 'প্রথম শিক্ষা বাঙ্গালার ইতিহাস' গ্রন্থটির প্রশংসা করে তিনি বলেছেন – "ইহা কেবল রাজগণের নাম ও যুদ্ধের তালিকা মাত্র নহে; ইহা প্রকৃত সামাজিক ইতিহাস।"[১৪] এই মন্তব্য থেকে সামাজিক ইতিহাসের প্রতি বঙ্কিমচন্দ্রের আকর্ষণ স্পষ্টভাবে প্রমাণিত।

বঙ্কিমচন্দ্র বাংলাদেশের সামাজিক ইতিহাসের সঙ্গে তার সাংস্কৃতিক ইতিহাস রচনার প্রতিও গুরুত্ব আরোপ করেছেন। বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ ইতিহাস লেখকদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেছেন – "মুসলমানদিগের সমাগমের পূর্বে পালরাজ্য ও সেনরাজ্য যে একীকৃত হইয়াছিল, তাহা ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র একপ্রকার প্রমাণ করিয়াছেন। সন্ধান কর, কি প্রকারে দুই রাজ্য একীকৃত হইল। একীকৃত হইলে পর, মুসলমান কর্তৃক জয় পর্য্যন্ত এই বৃহৎ সাম্রাজ্যের কিরূপ অবস্থা ছিল? ..... কোন্ কোন্ ধর্ম প্রচলিত ছিল, – বৈদিক, বৌদ্ধ, পৌরাণিক, চার্বাক, বৈষ্ণব, শৈব, অনার্য্য, কোন্ ধর্ম কতদূর প্রচলিত ছিল? শিক্ষা, শাস্ত্রালোচনা কতদূর প্রবল ছিল? কোন্ কোন্ কবি, কে কে দার্শনিক, – স্মার্ত্ত, নৈয়ায়িক, জ্যোতিষী জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন? কোন্ সময়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন? কি কি গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন? তাঁহাদিগের জীবনবৃত্তান্ত কি? তাঁহাদিগের গ্রন্থের দোষগুণ কি কি? তাঁদিগের গ্রন্থ হইতে কি শুভাশুভ ফল জন্মিয়াছে? বাঙ্গালীর চরিত্র কি প্রকারে তদ্দ্বারা পরিবর্তিত হইয়াছে? .... ইউরোপ সভ্য কত দিন? পঞ্চদশ শতাব্দীতে অর্থাৎ চারিশত বৎসর পূর্বে ইউরোপ আমাদিগের অপেক্ষাও অসভ্য ছিল। একটি ঘটনায় ইউরোপ সভ্য হইয়া গেল। অকস্মাৎ বিনষ্ট বিস্মৃত অপরিজ্ঞাত গ্রীক সাহিত্য ইউরোপ ফিরিয়া পাইল। ফিরিয়া পাইয়া, যেমন বর্ষার জলে শীর্ণা স্রোতস্বতী কূলপরিপ্লাবিনী হয়, যেমন মুমূর্ষু রোগী দৈব ঔষধে যৌবনের বলপ্রাপ্ত হয়, ইউরোপের অকস্মাৎ সেইরূপ অভ্যুদয় হইল। আজ পেত্রার্ক, কাল লুথর, আজ গেলিলিও, কাল বেকন্; ইউরোপের এইরূপ অকস্মাৎ

সৌভাগ্যোচ্ছ্বাস হইল। আমাদিগেরও একবার সেইদিন হইয়াছিল। অকস্মাৎ নবদ্বীপে চৈতন্যচন্দ্রোদয় ; তারপর রূপসনাতন প্রভৃতি অসংখ্য কবি ধর্মতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত। এ দিকে দর্শনে রঘুনাথ শিরোমণি, গদাধর, জগদীশ ; স্মৃতিতে রঘুনন্দন, এবং তৎপরগামিগণ। আবার বাঙ্গালা কাব্যের জলোচ্ছ্বাস। বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, চৈতন্যের পূর্বগামী। কিন্তু তাহার পরে চৈতন্যের পরবর্তিনী যে বাঙ্গালা কৃষ্ণবিষয়িণী কবিতা, তাহা অপরিমেয় তেজস্বিনী, জগতে অতুলনীয়া ; সে কোথা হইতে ?

আমাদের এই **Renaissance** কোথা হইতে ? কোথা হইতে সহসা এই জাতির এই মানসিক উদ্দীপ্তি হইল ? এ রোশনাইয়ে কে কে মশাল ধরিয়াছিল ? ধর্মবেত্তা কে ? শাস্ত্রবেত্তা কে, দর্শনবেত্তা কে ? ন্যায়বেত্তা কে ? কে কবে জন্মিয়াছিল ? কে কি লিখিয়াছিল ? কাহার জীবনচরিত কি ? কাহার লেখায় কি ফল ? এ আলোক নিবিল কেন ? নিবিল বুঝি মোগলের শাসনে। হিন্দু রাজা তোড়লমল্লের আমলে তুমার জমার দোষে। সকল কথা প্রমাণ কর।" [১৫]

বঙ্কিমচন্দ্র সামাজিক ইতিহাসের সঙ্গে বাংলার সাংস্কৃতিক ইতিহাসকে যেমন চেয়েছেন তেমনই বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসকেও উপেক্ষা করতে পারেন নি। এ প্রসঙ্গে ডঃ ভবতোষ দত্ত বলেছেন — " .... বাংলার ইতিহাস রচনায় রাজকাহিনীকে মাত্র একক প্রাধান্য দেওয়া যেমন ঠিক নয়, তেমনি রাজবৃত্তকে একেবারে বহিষ্কৃত করলেও ইতিহাস রচনায় বাধা ঘটতে পারে। আমাদের লোকজীবন রাজনৈতিক পটপরিবর্তনে আপাতদৃষ্টিতে অচঞ্চল বলে মনে হতে পারে কিন্তু সংঘাত সেখানেও এসেছে ; কোনোবার সাংস্কৃতিক পরিবর্তন হয়েছে প্রধান, কোনোবার অর্থনৈতিক পরিবর্তন হয়েছে লক্ষণীয়। নূতন ধর্মের উদ্ভব, সাহিত্যের নূতন বিকাশ, সাধারণ জীবনযাত্রার ধারার পরিবর্তন — বাংলার ইতিহাস বিচার করলে এ সবই লক্ষ্য করা যাবে। পাল, সেন, পাঠান অথবা মোগল রাজত্বে সামাজিক জীবনের সঙ্গে অর্থনৈতিক বিবর্তন স্পষ্টতই চোখে পড়ে। সুতরাং লোকবৃত্ত ইতিহাস রচনায় প্রধান হলেও রাজবৃত্তের কাঠামোটিকে অনুসরণ না করলে চলে না। বঙ্কিমচন্দ্রের অতীত আলোচনায় বাংলার ইতিহাসের এই দিকটি সম্পর্কেও ইঙ্গিত আছে। মনে হয়, তাঁর কল্পিত বাংলার ইতিহাসে চারটি স্তর ভাগের আভাস পাওয়া যায়। প্রথম,

তুর্কী বিজয় পর্যন্ত ; দ্বিতীয়, মোগল বিজয় পর্যন্ত ; তৃতীয়, ইংরেজ বিজয় পর্যন্ত ; চতুর্থ, ইংরেজ বিজয়ের পর। অবশ্য ইংরেজ বিজয়ের পর বাংলাদেশের ইতিহাস রচনা করবার সময় আসেনি। ইংরেজ রাজত্বে বাংলা ও ভারতবর্ষের ইতিহাস কি রকম দাঁড়াতে পারে, তার ইঙ্গিত অবশ্য তাঁর রচনায় আছে।" [১৬]

বঙ্কিমচন্দ্র আপন ইতিহাস সাধনাকে 'কুলি মজুরের' কাজ বলে বর্ণনা করেছেন। তাঁর মতে তাঁর বাংলার ইতিহাস বিষয়ক প্রবন্ধগুলির 'দর বড় বেশী নয়'। কারণ, " ইহার প্রণয়ন জন্য অনবসরবশতঃ এবং অন্যান্য কারণে ইচ্ছানুরূপ অনুসন্ধান ও পরিশ্রম করিতে পারি নাই। কাজেই বলিতে পারি না যে, ইহার দর বেশী।" [১৭] বঙ্কিমচন্দ্রের এই বক্তব্য থেকে ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে তাঁর আন্তরিকতা এবং তথ্য ও সত্যনিষ্ঠার প্রতি আগ্রহকে আমরা সহজেই উপলব্ধি করিতে পারি।

তবে এর অতিরিক্ত আরও কিছু এই প্রবন্ধগুলিতে আছে, — তা' হল দেশ প্রীতি। প্রবন্ধগুলি সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের বক্তব্য — " দর বেশী হউক বা কম হউক, ইহা পরিত্যাগ করিতে পারি না। যে দরিদ্র, সে সোনা রূপা জুটাইতে পারিল না বলিয়া কি বনফুল দিয়া মাতৃপদে অঞ্জলি দিবে না ? বাঙ্গালিতে বাঙ্গালার ইতিহাস যে যাহাই লিখুক না কেন, — সে মাতৃপদে পুষ্পাঞ্জলি।" [১৮]

বঙ্কিমচন্দ্র বাংলাদেশের প্রকৃত যে 'ধ্যান' রূপ তা' হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন। তিনি ধ্যানের দ্বারা 'মৃন্ময়ী' যে দেশ, তাকে 'চিন্ময়ী' দেবীতে রূপান্তরিত করেছিলেন। আমরা কমলাকান্তের দিব্যদৃষ্টির মাধ্যমে এই 'চিন্ময়ী' দেবীকে প্রত্যক্ষ করি —
" .... সুবর্ণমণ্ডিতা, এই সপ্তমীর শারদীয়া প্রতিমা। জলে হাসিতেছে, ভাসিতেছে আলোক বিকীর্ণ করিতেছে। এই কি মা ? হাঁ এই মা। চিনিলাম, এই আমার জননী জন্মভূমি — এই মৃন্ময়ী – মৃত্তিকারূপিণী – অনন্তরত্ন – ভূষিতা – এক্ষণে কালগর্ভে নিহিতা। রত্নমণ্ডিত দশভুজ - দশদিক্ - দশ দিকে প্রসারিত, তাহাতে নানা আয়ুধরূপে নানা শক্তি শোভিত ; পদতলে শত্রু–বিমর্দিত বীরজন কেশরী–শত্রু–নিষ্পীড়নে নিযুক্ত। এ মূর্তি এখন দেখিব না – আজি দেখিব না, কাল দেখিব না — কালস্রোত পার না হইলে দেখিব না —

কিন্তু একদিন দেখিব – দিগ্‌ভুজা, নানা প্রহরণ প্রহারিণী শত্রুমর্দিনী, বীরেন্দ্রপৃষ্ঠ-বিহারিণী - দক্ষিণে লক্ষ্মী ভাগ্যরূপিণী, বামে বিদ্যাবিজ্ঞানমূর্তিময়ী, সঙ্গে বলরূপী কার্ত্তিকেয়, কার্য্যসিদ্ধিরূপী গণেশ, আমি সেই কালস্রোত মধ্যে দেখিলাম, এই সুবর্ণময়ী বঙ্গ প্রতিমা !" [৯৯] আনন্দমঠ উপন্যাসেও দেখি যে, সত্যানন্দ মহেন্দ্রকে সম্পূর্ণ একই মাতৃরূপ দর্শন করিয়েছেন — 'মা যা হইবেন'। [১০০]

এই যে মাতৃপদেবৃতা 'সুবর্ণময়ী বঙ্গপ্রতিমা' — আমাদের বাংলাদেশ ; বঙ্কিমচন্দ্র সে বাংলাদেশের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস রচনার জন্য বাঙালি মাত্রকেই আহ্বান করে বলেছেন — " তুমি লিখিবে, আমি লিখিব, সকলেই লিখিবে। যে বাঙ্গালী তাহাকেই লিখিতে হইবে। মা যদি মরিয়া যান, তবে মার গল্প করিতে কত আনন্দ। আর এই আমাদিগের সর্বসাধারণের মা জন্মভূমি বাঙ্গালাদেশ, ইহার গল্প করিতে কি আমাদিগের আনন্দ নাই ? " [১০১] বঙ্কিমচন্দ্রের এই বক্তব্যে তাঁর ঐতিহাসিক সত্যনিষ্ঠা দেশপ্রেমের তুলিকায় রঞ্জিত হয়ে উঠেছে।

স্বদেশপ্রীতির আবেগ বঙ্কিমচন্দ্রের ইতিহাস চর্চার অন্যতম প্রধান মূলধন ছিল, কিন্তু তিনি আবেগ সর্বস্ব ছিলেন না। তাঁর স্বদেশ প্রীতি কোথাও প্রবল হয়ে সত্যানুসন্ধিৎসার পথকে রুদ্ধ করেনি। যুক্তি ও প্রমাণ বিচারে প্রাপ্ত প্রকৃত সত্যকে কখনো তিনি প্রচ্ছন্ন রাখার প্রয়াস করেন নি। সত্যানুসন্ধিৎসার প্রবৃত্তি ও স্বদেশপ্রীতির বশে তিনি ইতিহাসচর্চায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। বদলির চাকুরীতে গুরুত্বপূর্ণ সরকারী কাজে স্থান থেকে স্থানান্তরে থেকেও তিনি যে গভীর অধ্যবসায় ও কঠোর নিষ্ঠা সহকারে আত্মবিস্মৃত বাঙালি জাতির সামনে স্বদেশের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস তুলে ধরার অক্লান্ত প্রয়াস চালিয়েছিলেন তা যে কোনো ইতিহাস গবেষকের কাছে গ্রহণীয় আদর্শ হতে পারে।

সূত্র - নির্দেশ

১। ভবতোষ দত্ত — চিন্তানায়ক বঙ্কিমচন্দ্র, ১৩৯৪, পৃঃ ২০।

২। ১৮১৩ খ্রিস্টাব্দের 'সনদ আইন'-এর ৪৩ নম্বর ধারায় বলা হয়েছিল যে, প্রতি বছর সাহিত্যের উন্নতি ও নতুন গবেষণার জন্য এক লক্ষ টাকা ব্যয় হবে। কিন্তু সেখানে 'সাহিত্য' বলতে প্রাচ্য অথবা পাশ্চাত্য সাহিত্যকে সুস্পষ্ট ভাবে নির্দিষ্ট করে না দেওয়ায়, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যবাদীদের মধ্যে প্রবল দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়। ইতিমধ্যে লর্ড মেকলে General Committee of Public Instruction -এর চেয়ারম্যান নির্বাচিত হলেন। তিনি এই দ্বন্দ্বের সমাধান কল্পে ইংরেজি সাহিত্য ও বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য সুপারিশ করেন। এই সুপারিশ 'মেকলে মিনিট' নামে পরিচিত। লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্ক ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দের ৭ই মার্চ এক অধ্যাদেশ বলে এই 'মিনিট'-কে আইনে পরিণত করেন। এই সূত্র ধরে বাংলাদেশের শিক্ষালয়ে ইতিহাস শিক্ষার শুভ-সূচনা হয়।

৩। প্রবোধ চন্দ্র সেন - বাঙলার ইতিহাস সাধনা, ১৯৯২, পৃঃ ১০৫।

৪। সজনী কান্ত দাস — বঙ্কিম চন্দ্র ; ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত সাহিত্য সাধক চরিতমালা (২য় খন্ড), ১৩৮৮, পৃঃ ১৭।

৫। অলোক রায় — বঙ্কিমচন্দ্রের ইতিহাস ভাবনা, আকাদেমি পত্রিকা, দ্বিতীয় সংখ্যা, মে ১৯৮৯, পৃঃ ৯।

৬। Pratulchandra Gupta — Foundation of the University, Hundred years of the University of Calcutta, Ed. by Pramatha Nath Banerjee & Others, 1957, p.64.

৭। C.U.Magazine, May I,1894. — উদ্ধৃতি, সত্যনারায়ণ দাশ, বঙ্গদর্শন ও বাঙালির মনন সাধনা, ১৯৭৪, পৃঃ১২৫(টীকা)।

৮। ১৮৪৯ অক্টোবর থেকে ১৮৫০ সেপ্টেম্বর শিক্ষাবর্ষে বঙ্কিমচন্দ্র হুগলী কলেজের স্কুলে জুনিয়র সেকশনের উচ্চতম শ্রেণীর ছাত্র ছিলেন সেখানে তাঁকে 'বঙ্গেতিহাস' পড়তে হয়েছিল। খুব সম্ভব এই 'বঙ্গেতিহাস' মার্শম্যানের History of Bengal - এর বঙ্গানুবাদ। কিন্তু অনুবাদক কে ছিলেন তা জানা যায় না।

৯। প্রবোধ চন্দ্র সেন — বাংলার ইতিহাস সাধনা, ১৯৯২, পৃঃ ২২।

১০। পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় — বঙ্কিমচন্দ্রের বাল্যকাল, সোমেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত, কাছের মানুষ বঙ্কিমচন্দ্র, ১৯৬৪, পৃঃ ১০৬।

১১। অমিত্র সূদন ভট্টাচার্য্য — বঙ্কিমচন্দ্র ও বঙ্গদর্শন, ১৯৭১, পৃঃ ১৩৫।

১২। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় — বঙ্গদর্শন, পত্রসূচনা, ১ম খন্ড, ১ম সংখ্যা, ১২৭৯, (পুনর্মুদ্রণ, ১৯৮০), পৃঃ ৫।

১৩। সত্যনারায়ণ দাশ — বঙ্গদর্শন ও বাঙালির মনন সাধনা, ১৯৭৪, পৃঃ ৩।

১৪। B.P.Mukherji — History; A.C.Gupta (ed.), Studies in the Bengal Renaissance, 1958, p.360.

১৫। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী — 'বঙ্কিম চন্দ্র কাঁঠাল পাড়ায়' ; সোমেন্দ্র নাথ বসু সম্পাদিত, কাছের মানুষ বঙ্কিমচন্দ্র, ১৯৬৪, পৃঃ ৭৬।

১৬। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় — বিজ্ঞাপন, বিবিধ প্রবন্ধ (২য় ভাগ), বঙ্কিম রচনাবলী (২য় খন্ড), ১৩৯২, পৃঃ ১০৩০।

১৭। 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার অধিকাংশ রচনায় লেখকের নাম মুদ্রিত হত না। 'মুসলমান কর্তৃক বঙ্গ-বিজয়' প্রবন্ধটিতে বঙ্কিমচন্দ্রের নাম মুদ্রিত ছিল না। প্রবন্ধটি বঙ্কিম-রচনাবলীতেও সংকলিত হয়নি। তবে প্রবন্ধটি যে বঙ্কিমচন্দ্রেরই রচনা, প্রবন্ধ মধ্যে তার প্রমাণ আছে — " ভারতবর্ষীয় প্রজার পক্ষে রাজা রাজার .... একথা ভারত-কলঙ্কে একবার বুঝাইয়াছি।" 'ভারত কলঙ্ক' প্রবন্ধটি বঙ্কিমচন্দ্রের রচনা।

১৮। রমাপ্রসাদ চন্দ — ইতিহাসে বাঙালী, ১৯৮১, পৃঃ ৫১।

১৯। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় — বঙ্গে ব্রাহ্মণাধিকার — প্রথম প্রস্তাব, বিবিধ প্রবন্ধ, বঙ্কিম রচনাবলী (২য় খন্ড), ১৩৯২, পৃঃ ৩১৯—২০।

২০। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় — প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩২১।

২১। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় — প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩২২।

২২। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় — বঙ্গে ব্রাহ্মণাধিকার — দ্বিতীয় প্রস্তাব, বঙ্গ দর্শন, ৪র্থ খন্ড, অষ্টম সংখ্যা, ১২৮২, (পুনর্মুদ্রণ, ১৯৮০), পৃঃ ২৮৯।

২৩। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় — প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৯৪।

২৪। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় — প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৯৫।

২৫। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী — প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭৬।

২৬। নীহার রঞ্জন রায় — বাঙালীর ইতিহাস, ১৯৮০, পৃঃ ১৮১—৮৩।

২৭। রমাপ্রসাদ চন্দ — ইতিহাসে বাঙালী, ১৯৮১, পৃঃ ৫১।

২৮। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় — বাঙ্গালার ইতিহাস, বিবিধ প্রবন্ধ, বঙ্কিম রচনাবলী (২য় খন্ড), ১৩৯২, পৃঃ ৩৩০।

২৯। রমেশ চন্দ্র মজুমদার — বাংলাদেশের ইতিহাস (প্রাচীন যুগ), ১৯৮৮, পৃ: ২৬৭।

৩০। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'মৃণালিনী' উপন্যাসে হেমচন্দ্রের প্রতি মাধবাচার্য্যের উক্তি স্মরণীয় — "যবনেরা নবদ্বীপ অধিকার করিয়াছে বটে, কিন্তু নবদ্বীপ ত গৌড় নহে।"; বঙ্কিম রচনাবলী (১ম খন্ড), ১৩৯১, পৃ: ২০১।

৩১। রমেশ চন্দ্র মজুমদার — প্রাগুক্ত, পৃ: ১৩৭–৩৮।

৩২। বিদ্যাপতি বাঙালি কবি নন, মৈথিলী কবি — এ তত্ত্ব সর্বপ্রথম প্রকাশ করেন রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, বঙ্গদর্শন, ১২৮২, জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায়, 'বিদ্যাপতি' নামক প্রবন্ধে। তার আগে পর্যন্ত সকলে বিদ্যাপতিকে বাঙালি কবি বলেই জানতেন। তাছাড়া নানা কারণে আজও বিদ্যাপতিকে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

৩৩। **Tapan Roy Choudhuri** — **Bengal Under Akbar and Jehangir, 1953, p.43.**

৩৪। ভবতোষ দত্ত — চিন্তানায়ক বঙ্কিমচন্দ্র, ১৩৯৪, পৃ: ১০৭।

৩৫। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় — বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা, বিবিধ প্রবন্ধ, বঙ্কিম রচনাবলী (২য় খন্ড), ১৩৯২, পৃ: ৩৩৬।

৩৬। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় — প্রাগুক্ত, পৃ: ৩৩৬।

৩৭। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর — ভারতবর্ষের ইতিহাস, ইতিহাস, (প্রবোধ চন্দ্র সেন ও পুলিন বিহারী সেন কর্তৃক সংকলিত), ১৩৬৮, পৃ: ৫।

৩৮। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় — প্রাগুক্ত, পৃ: ৩৩৬।

৩৯। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় — প্রাগুক্ত, পৃ: ৩৩৭।

৪০। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় – বাঙ্গালীর উৎপত্তি, বিবিধ প্রবন্ধ, বঙ্কিম রচনাবলী (২য় খন্ড), ১৩৯২, পৃ: ৩৫২।

৪১। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় – প্রাগুক্ত, পৃ: ৩৬২।

৪২। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় – প্রাগুক্ত, পৃ: ৩৫২–৫৩।

৪৩। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় – প্রাগুক্ত, পৃ: ৩৫৩।

৪৪। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় – প্রাগুক্ত, পৃ: ৩৬০।

৪৫। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় – প্রাগুক্ত, পৃ: ৩৬২।

৪৬। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় – প্রাগুক্ত, পৃ: ৩৬২–৬৩।

৪৭। বঙ্কিমচন্দ্রের পর **Sir Herbert Risley** বাঙালির উৎপত্তি বিচারে ভাষা ছেড়ে আকৃতির উপর গুরুত্ব দেন। তাঁর মতে বাঙালি মোঙ্গলীয় ও দ্রাবিড় জাতির সংমিশ্রনে উৎপন্ন। কিন্তু পন্ডিত প্রবর রমা প্রসাদ চন্দ তাঁর **'Indo Aryan Races'** গ্রন্থে রিজলী সাহেবের মতের প্রতিবাদ করে বলেন, যে, পামির ও টাকলামাকান অথলের অধিবাসী হোমো আলপাইনাস নামে অভিহিত এক জাতীয় মানুষই বাঙালির আদি পুরুষ। এ ছাড়া আরও অনেকে এ বিষয়ে গবেষণা করেছেন। এ বিষয়ে ঐতিহাসিক ডঃ রমেশ চন্দ্র মজুমদার সাধারণ ভাবে অধ্যাপক প্রশান্ত চন্দ্র মহলানবীশের সিদ্ধান্ত মান্য করেন। বাঙালির উৎপত্তি বিষয়ে **'Journal of Asiatic Society of Bengal, N.S.XXIII, p.301-33** - এ অধ্যাপক মহলানবীশের যে প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছিল ডঃ রমেশ চন্দ্র মজুমদার মহাশয় সেই প্রবন্ধটির সার–সংকলন করেছেন তাঁর 'বাংলাদেশের ইতিহাস (প্রাচীন যুগ)' নামক গ্রন্থে।

৪৮। রমেশ চন্দ্র মজুমদার – বাংলাদেশের ইতিহাস (প্রাচীন যুগ), ১৯৮৮, পৃ: ১৪–১৫।

৪৯। রমা প্রসাদ চন্দ – ইতিহাসে বাঙালী, ১৯৮১, পৃ: ৫২।

৫০। রমেশ চন্দ্র মজুমদার — প্রাগুক্ত, পৃ: ১।

৫১। তিব্বত দেশীয় লামা তারানাথ ১৫৭৩ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং তিনি ১৬০৮ খ্রিস্টাব্দে 'ভারতে বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস' নামে একটি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ রচনা করেন। প্রাচ্যদেশে তিনি শুধুমাত্র ভঙ্গন (বঙ্গাল) দেশের রাজবংশের বিবরণ দিয়েছেন। তাঁর মতে বাংলায় পালবংশীয় রাজাদের আগে চন্দ্রবংশীয় রাজারা রাজত্ব করতেন। চন্দ্রবংশের রাজা মিলচন্দ্র বাংলা, ত্রিহুতি, কামরূপ প্রভৃতি দেশ শাসন করতেন। বিমলচন্দ্রের পুত্র গোবিচন্দ্র। বাংলাদেশের রাজা গোপীচন্দ্র (গোপীচাঁদ) ও তাঁর মা ময়নামতী সম্পর্কে যে বহু প্রবাদ, কাহিনী ও গীতিকাব্য প্রচলিত আছে, অনেকের মতে সেই রাজা গোপীচন্দ্র এবং তারানাথ কথিত গোবি-চন্দ্র এক ও অভিন্ন। তবে এ বিষয়ে ঐতিহাসিকেরা এখনও নিঃসন্দেহ হতে পারেন নি।

৫২। প্রাচীন বাংলার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যগুলি হল — উত্তরবঙ্গে পুণ্ড্র ও বরেন্দ্র, পশ্চিমবঙ্গে রাঢ় ও তাম্রলিপ্তি, দক্ষিণ ও পূর্ববঙ্গে সমতট, হরিকেল, বঙ্গ ও বঙ্গাল (বঙ্গ ও বঙ্গাল দুটি পৃথক রাজ্য); এ ছাড়া উত্তর ও পশ্চিমবঙ্গের কতকাংশ গৌড় নামে সুপরিচিত ছিল। এ সব রাজ্যের সীমা ও বিস্তৃতি সঠিক ভাবে নির্ণয় করা যায় না।

৫৩। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় — বঙ্গে ব্রাহ্মণাধিকার — দ্বিতীয় প্রস্তাব বঙ্গদর্শন ৪র্থ খন্ড, অষ্টম সংখ্যা, ১২৮২, (পুণর্মুদ্রন, ১৯৮০), পৃ: ২৯৫।

৫৪। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় — বাঙ্গালার ইতিহাস, বিবিধ প্রবন্ধ, বঙ্কিম রচনাবলী (২য় খন্ড), ১৩৯২, পৃ: ৩৩১।

৫৫। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় — বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা, বিবিধ প্রবন্ধ, বঙ্কিম রচনাবলী (২য় খন্ড) ১৩৯২, পৃ: ৩৩৭।

৫৬। বঙ্কিমচন্দ্র মিন্‌হাজ রচিত 'তবকাৎ-ই-নাসিরী' নামক গ্রন্থটি পাঠ করেন নি। কারণ বঙ্কিমচন্দ্র ফারসি জানতেন না এবং বঙ্কিমচন্দ্রের সময় পর্যন্ত গ্রন্থটির কোন পূর্ণাঙ্গ ইংরেজী অনুবাদ হয়নি। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'মুসলমান কর্তৃক বাঙ্গালা জয়' নামক প্রবন্ধে মিন্‌হাজ কথিত মুসলমানদের বাংলা জয়ের কাহিনীর যে সারার্থ প্রদান করেছেন তা' Charles Stewart - এর History of Bengal গ্রন্থ থেকে হুবহু অনুবাদ।

৫৭। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় — মুসলমান কর্তৃক বাঙ্গালা জয়, বঙ্গদর্শন, ১ম খন্ড, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ১২৮১ (পুন-র্মুদ্রণ, ১৯৮২), পৃ: ১৬৪-৬৫।

৫৮। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় — প্রাগুক্ত, পৃ: ১৬৬।

৫৯। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় — প্রাগুক্ত, পৃ: ১৬৬।

৬০। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় — প্রাগুক্ত, পৃ: ১৬৬-৬৭।

৬১। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় — প্রাগুক্ত, পৃ: ১৬৯।

৬২। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় — প্রাগুক্ত, পৃ: ১৭০।

৬৩। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় — প্রাগুক্ত, পৃ: ১৬৭।

৬৪। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় — বাঙ্গালার কলঙ্ক, বিবিধ প্রবন্ধ, বঙ্কিম রচনাবলী (২য় খন্ড), ১৩৯২, পৃ:৩৩৩।

৬৫। Macqulay's Writings on India — Quoted, R.K.Das Gupta in C.H. Philips (ed.) Historians of India, Pakistan and Ceylon, 1967, p.236.

৬৬। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় — প্রাগুক্ত, পৃ: ৩৩৩।

৬৭। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় — ভারত-কলঙ্ক, বিবিধ প্রবন্ধ, বঙ্কিম রচনাবলী (২য় খন্ড), ১৩৯২, পৃ: ২৩৫।

রচনাবলী (২য় খন্ড), ১৩৯২, পৃ: ২৮৭।

৬৮। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় — বাঙ্গালার কলঙ্ক, বিবিধ প্রবন্ধ, বঙ্কিম রচনাবলী (২য় খন্ড), ১৩৯২, পৃঃ ৩৩৬।

৬৯। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় — প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৩৩।

৭০। রমেশচন্দ্র মজুমদার — বাংলাদেশের ইতিহাস (প্রাচীন যুগ), ১৯৮৮, পৃঃ ২৬৭–৬৮।

৭১। মেগাস্থিনিস সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের রাজধানী পাটলিপুত্রে বেশ কয়েক বছর ছিলেন এবং ভারতবর্ষ সম্পর্কে তাঁর অভিজ্ঞতাসমূহ গ্রীক ভাষায় রচিত 'ইন্ডিকা' নামক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করে গিয়েছিলেন। দুঃখের বিষয় মেগাস্থিনিসের মূল গ্রন্থটি অখন্ডভাবে উত্তকালে আমাদের হস্তগত হয়নি। কিন্তু ঐ মৌলিক গ্রন্থটি নষ্ট হয়ে গেলেও, তার বিভিন্ন অংশ ডিওডোরাস, স্ট্রাবো, কুইন্টাস, কার্টিয়াস, প্লুটার্ক, প্লিনী প্রভৃতি গ্রীক ও রোমান পন্ডিতদের লেখনীর মাধ্যমে খন্ডিত ও বিচ্ছন্ন ভাবে আমাদের গোচরীভূত হয়েছে। জার্মান পন্ডিত সোয়েন বেক বিচ্ছিন্ন বিবরণগুলি সংগ্রহ করেছিলেন এবং পাটনা গণর্ভমেন্ট কলেজের অধ্যক্ষ জে.ডবলিউ, মাকক্রিন্ডল সেগুলি ইংরেজি ভাষায় অনুবাদ করেন।

৭২। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় — প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৩৪।

৭৩। প্রভাত কুমার ঘোষ — গঙ্গারিডি ও বঙ্গভূমি, ১৯৮৮, পৃঃ ১৯।

৭৪। এই প্রসঙ্গে বলা দরকার যে, গঙ্গানদীর শেষ ভাগ পশ্চিমবঙ্গের মধ্য দিয়েই সাগরে লীন হয়েছে। তাম্রলিপ্ত, সপ্তগ্রাম, ত্রিবেণী, পান্ডুয়া, পূর্বস্থলী, গৌড় প্রভৃতি রাঢ়দেশেই অবস্থিত।

৭৫। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় — বঙ্গদেশের কৃষক, বিবিধ প্রবন্ধ, বঙ্কিম রচনাবলী (২য় খন্ড), ১৩৯২, পৃঃ ২৮৭।

৭৬। বদরুদ্দীন উমর — ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও উনিশ শতকের বাঙালী সমাজ, ১৩৮৮, পৃঃ ৬৯।

৭৭। বদরুদ্দীন উমর — প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬৮–৬৯।

৭৮। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় – বঙ্গদেশের কৃষক, বিবিধ প্রবন্ধ, বঙ্কিম রচনাবলী (২য় খন্ড), ১৩৯২, পৃ:২৮৮।

৭৯। বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় – প্রাগুক্ত, পৃ: ২৮৯।

৮০। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় – প্রাগুক্ত, পৃ: ২৯১।

৮১। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় – প্রাগুক্ত, পৃ: ২৯১–৯২।

৮২। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় – প্রাগুক্ত, পৃ: ২৯৬।

৮৩। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় – প্রাগুক্ত, পৃ: ২৯৬।

৮৪। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় – প্রাগুক্ত, পৃ: ৩০৫।

৮৫। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় – প্রাগুক্ত, পৃ: ৩১৩–১৪।

৮৬। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় – প্রাগুক্ত, পৃ: ৩০৭।

৮৭। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় – প্রাগুক্ত, পৃ: ২৯৮।

৮৮। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় – বাঙ্গালির বাহুবল, বিবিধ প্রবন্ধ, বঙ্কিম রচনাবলী (২য় খন্ড), ১৩৯২, পৃ: ২০৯।

৮৯। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় – প্রাগুক্ত, পৃ: ২১০।

৯০। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় – প্রাগুক্ত, পৃ: ২১৩।

৯১। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় – কৃষ্ণচরিত্র, প্রথম খন্ড, তৃতীয় পরিচ্ছেদ, বঙ্কিম রচনাবলী (২য় খন্ড), ১৩৯২, পৃ: ৪১০,

৯২। দ্বিজেন্দ্রলাল নাথ – আধুনিক বাঙালী সংস্কৃতি ও বাংলা সাহিত্য, ১৩৬৭, পৃ: ২২১।

৯৩। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় – বাঙ্গালার ইতিহাসের ভগ্নাংশ, বিবিধ প্রবন্ধ, বঙ্কিম রচনাবলী (২য় খন্ড), ১৩৯২, পৃ: ৩৪৩–৪।

৯৪। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় —বাঙ্গালার ইতিহাস, বিবিধ প্রবন্ধ, বঙ্কিম রচনাবলী (২য় খন্ড), ১৩৯২, পৃঃ ৩৩১।

৯৫। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় – বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা, বিবিধ প্রবন্ধ, বঙ্কিম রচনাবলী (২য় খন্ড), ১৩৯২, পৃঃ ৩৩৮—৩৯।

৯৬। ভবতোষ দত্ত – চিন্তানায়ক বঙ্কিমচন্দ্র, ১৩৯৪, পৃঃ৯৭-৯৮।

৯৭। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় – বিজ্ঞাপণ, বিবিধ প্রবন্ধ (২য় ভাগ) বঙ্কিম রচনাবলী (২য় খন্ড), ১৩৯২, পৃঃ ১০৩১।

৯৮। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় – প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০৩১।

৯৯। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় – কমলাকান্ত, আমার দুর্গোৎসব, বঙ্কিম রচনাবলী (২য় খন্ড), ১৩৯২, পৃঃ ৮০।

১০০। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় – আনন্দমঠ, প্রথম খন্ড, একাদশ পরিচ্ছেদ, বঙ্কিম রচনাবলী (১ম খন্ড), ১৩৯১, পৃঃ ৬৭৭।

১০১। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় – বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা, বিবিধ প্রবন্ধ, বঙ্কিম রচনাবলী (২য় খন্ড), ১৩৯২, পৃঃ ৩৩৭।